স্বপ্নসম্ভব

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

লেখার টেবিলে একটি মেয়ের নাম আর ঠিকানা দেখে চমকে উঠলেন লেখক। কিছুতেই মনে পড়ে না কে এই মেয়েটা। মনের গভীরে ডুব দিয়ে লেখক খুঁজে পেলেন তার পরিচয়। তারপর একদিন তাদের গ্রামে গিয়ে শুনলেন, মেয়েটি মারা গেছে। কিন্তু তার মৃত্যু কি স্বাভাবিক, নাকি তাকে হত্যা করা হয়েছে?

বিভাকে টেলিফোন করে বারবার কে শাসায়? কে ধীমানের সঙ্গে বিভার সম্পর্ক ফাঁস করার হুমকি দেয়? শিলিগুড়িতে বসে বিভার ধরা টেলিফোন-টেপ শুনতে শুনতে ধীমান বুঝে ফেললো কে ফোন করে এ-সব কথা বলে। ওদিকে ইনু সিনেমায় টুকটাক অভিনয় করছে। কিন্তু সেখান থেকে তাকে টেনে নিয়ে যেতে আসে তার বাবা। মেয়েটি কি আবার ফিরে যাবে বস্তিজীবনে? বিভাই বা কি করবে? নিপুণ হাতে দুটি গভীর সমস্যার সমাধান করেছেন যশস্বী লেখক।

লেখার টেবিল থেকে মাত্র দু'মিনিটের জন্য উঠে গিয়েছিলেন পুলকেশ, টেলিফোন ধরার জন্য। এরকম হঠাৎ উঠে যেতে হলে মনোযোগ নষ্ট হয়, আবার ভাবনাটাকে ফিরিয়ে আনতে কষ্ট হয়, কিন্তু উপায় তো নেই। কতরকম টেলিফোন আসে, কোন্‌টা কাজের কোন্‌টা অকাজের তা তো বোঝা যাবে না আগে থেকে। বিদেশের লেখকদের প্রাইভেট সেক্রেটারি থাকে, তারা টেলিফোন ধরে, চিঠিপত্রের উত্তর দেয়; এদেশের লেখকদের সেরকম কোনো সহকারি রাখার সামর্থ্য থাকে না। পুলকেশের স্ত্রী ঊর্মিলা মাঝে মাঝে সাহায্য করেন, কিন্তু সকালবেলা ঊর্মিলাকে পাওয়া যায় না। ঊর্মিলা একটা স্কুলে পড়াতে যান, বেরিয়ে যান ভোর ছ'টায়, বেশ দূরের স্কুল, ফিরতে ফিরতে এগারোটা বেজে যায়। সকালের ঐ সময়টায় দুলাল নামে বাচ্চা কাজের ছেলেটি বাড়ির সব কিছু সামলায়। কিন্তু টেলিফোনের ব্যাপারে তার ওপর ভরসা করা যায় না।

টেলিফোন ধরতে গিয়ে শুধু যে দু'মিনিট সময় নষ্ট হলো তাই-ই নয়, পুলকেশের মেজাজও বিগড়ে গেল। সম্পূর্ণ অর্থহীন, বিরক্তিকর ব্যাপার। একজন লোক প্রথমে বললো, সে পুলকেশের একটি গল্প নিয়ে ফিল্ম বানাতে চায়। এতে পুলকেশের পুলকিত হবারই কথা, বেশ কিছু টাকা পাওয়া যেতে পারে। আকস্মিকভাবে কিছু টাকা পেতে কার না ভালো লাগে। লোকটি প্রথমে ইনিয়ে বিনিয়ে নিজে কী কী ফিল্ম বানিয়েছে তার একটা ফিরিস্তি দিয়ে পুলকেশের সঙ্গে দেখা করার একটা সময় চাইলো। পুলকেশ আগামীকালই দেখা করতে রাজী। এ পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল, শেষমুহূর্তে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কোন্ গল্পটা নেবার কথা ভাবছেন? লোকটি সে নামটা জানাতেই পুলকেশের বলে উঠতে ইচ্ছে করলো, দূর শালা! সেটা পুলকেশের গল্পই নয়, অন্য একজনের উপন্যাস। সিনেমার লোকেরা এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়! ভালো করে খোঁজ-খবর না নিয়েই একজন লেখককে ফোন করে তার সময় নষ্ট করা যায়? এই লোকটি এমনই নির্লজ্জ, পুলকেশ যখন জানালেন যে ঐ উপন্যাসটি তাঁর লেখা নয়, তখনও সে জিজ্ঞেস করলো, সেই লেখকের ফোন নাম্বারটা বলতে পারেন?

কড়া গলায় 'জানি না' বলে দুম করে ফোনটা রেখে দিলেন পুলকেশ।

বেশি রাগ দেখানো উচিত নয়, অন্য লেখকটির টেলিফোন নাম্বার সত্যিই জানেন না পুলকেশ। তবু তাঁর কণ্ঠস্বরে রাগের আঁচ এসে গিয়েছিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলেন। তারপর ফিরে এলেন লেখার টেবিলে।

পুলকেশ বড় প্যাডের কাগজে লেখেন। পাঁচ-সাতটা কলম ছড়ানো থাকে পাশে। লেখেন একটাই কলমে, তবু অনেকগুলি কলম না থাকলে তিনি স্বস্তি পান না। টেবিলের

ওপর ডাঁই করা রয়েছে প্রচুর বই। তিনি একটানা কোনো বই না পড়ে একবার এ বই, আরেকবার অন্য বই পড়েন। ঊর্মিলাকে তিনি টেবিল গুছোতে দেন না, বেশি সাজানো-গোছানো টেবিল তাঁর পছন্দ নয়।

প্যাডের একটা পৃষ্ঠায় আধখানা লেখা হয়েছে, তার ওপর কলমটা খোলা, সেই কলমের পাশে একটা দোমড়ানো-মোচড়ানো কাগজ।

পুলকেশের ভুরু কুঁচকে গেল। এ কাগজটা কোথা থেকে এলো? একটু আগেও তো ছিল না।

ভাঁজ খুলে দেখলেন, তাতে শুধু একটা নাম আর ঠিকানা লেখা। মীনাক্ষী বসুচৌধুরী, ব্রজেশচন্দ্র গার্লস স্কুল, চকবাজার, বীরভূম।

ভুরু কুঁচকেই রইলেন পুলকেশ। এটা কার ঠিকানা? এই নামে কারুকে চেনেন না পুলকেশ। মেয়েলি হাতের লেখা, কাগজটা বেশ পুরোনো, এটা এখানে এলো কী করে?

চকবাজার কোথায় পুলকেশ জানেন না, কখনো নামও শোনেননি। মীনাক্ষী বসুচৌধুরী কে? পুলকেশ মীনাক্ষী মজুমদার নামে একজনকে চেনেন, সে থাকে বেহালায়। অনেক সময় পাঠিকারা চিঠি লেখে, সকলের নাম মনে রাখা সম্ভব নয়, কিন্তু এখানে কোনো চিঠি নেই, শুধু ঠিকানা।

সবচেয়ে আশ্চর্য কথা, কাগজটা এলো কোথা থেকে?

তিনি হাঁক দিলেন, দুলাল, দুলাল!

বাথরুমে কাপড় কাচতে কাচতে সাবান মাখা হাতে দুলাল ছুটে এলো। পুলকেশ জিজ্ঞেস করলো, এই কাগজটা এখানে তুই রেখেছিস?

দুলাল বললো, না তো! আমি দেখিনি!

দুলাল অনেকক্ষণ ধরে কাপড় কাচছে, পুলকেশ শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন, সে ভিজে হাতে কাগজটা কী করে আনবে? কোনো জামা-প্যান্টের পকেটেও কাগজটা থাকা সম্ভব নয়, দু'-একদিনের ছাড়া পোশাক, দু'-একদিন আগে কেউ এই ঠিকানা-লেখা কাগজটা দিলে পুলকেশের মনে থাকতো না?

দুলালকে অকারণে ধমক দিয়ে বললেন, সারা সকাল ধরে শুধু কাপড়ই কাচবি নাকি? এক কাপ চা করে নিয়ে আয়!

কাগজটা কোনো বইয়ের ভাঁজে ছিল? হাওয়ায় উড়ে এসেছে?

শীতকাল, হাওয়া-টাওয়া বিশেষ নেই। মাটিতে পড়লো না, ঠিক প্যাডের পাতার মাঝখানে, যেন কেউ পুলকেশের চোখে পড়বার জন্যই রেখে গেছে এইমাত্র।

যে-কোনো ব্যাপারেই কার্য-কারণের ব্যাখ্যা না পেলে মনটা খচখচ করে। পুলকেশ যেই টেলিফোন ধরার জন্য উঠে গেলেন, অমনি কাগজটা উড়ে এসে পড়লো, এটা ঠিক যেন বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। সম্পূর্ণ অচেনা নাম-ঠিকানা বলেই আরও বেশি অস্বস্তি লাগে।

যাই হোক, কী আর করা যাবে! সকাল সাড়ে নটার সময় অলৌকিক তো কিছু ঘটতে পারে না। কোনো জায়গা থেকে উড়ে এসে পড়েছে নিশ্চয়ই।

পুলকেশ আবার লেখায় মন দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু দুটি দু'রকম চিন্তা তাঁর ব্যাঘাত ঘটাতে লাগলো। অন্য একজন লেখকের উপন্যাস ফিল্ম হবে, সে জন্য তাঁকে বিরক্ত করা কেন? সেই লেখকটি পুলকেশের চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয়, তার অনেক লেখাই সিনেমার পর্দায় দেখা গেছে, সিনেমাওয়ালারা সেই লেখকটির লেখাই পছন্দ করে! মীনাক্ষী বসুচৌধুরী কে, কেন তার কথা মনে পড়ছে না?

বারবার পুলকেশ তাকাচ্ছেন সেই কাগজটার দিকে। লাইনটানা কাগজ। মনে হয় কোনো ছোট বাঁধানো পাতা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া, ডায়েরি নয়, দিন-তারিখ নেই।

মনে মনে চুলোয় যাক বলে পুলকেশ সেই কাগজটা তুলে নিয়ে দলা পাকিয়ে ফেলে দিলেন ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে। ফেলে দিলেও সেই নাম আর ঠিকানা মন থেকে মুছে গেল না।

যে-লেখাটা লিখতে বসেছেন পুলকেশ, সেটা আগামীকালের মধ্যে শেষ করতেই হবে, সম্পাদকের তাগাদা আছে। মনের ওপর জোরজবরদস্তি করে লিখে ফেললেন, আরও দু'পাতা।

ঊর্মিলা ফিরে এলেই পুলকেশ বুঝতে পারেন তাঁর স্নান করার সময় হয়ে গেছে।

ঠিক কোনো অফিসে চাকরি করেন না পুলকেশ। তবে একটি বিজ্ঞাপন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। সপ্তাহে তিন-চার দিন দুপুর একটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত সেই অফিসে বসেন, বিজ্ঞাপনের কপি লিখতে বা অনুবাদ করতে হয়। শুধু বাংলা গল্প-উপন্যাস লিখে তেমন কিছু উপার্জন করা যায় না। অমুক আর অমুক লেখকের মতন পুলকেশের গল্প তো আর সিনেমা হয় না যখন-তখন।

ওঁদের একটিই মেয়ে, সে থাকে দিল্লি, জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। বেশিদিন মেয়েকে ছেড়ে থাকতে ঊর্মিলার কষ্ট হয়, তিনি এ মাসের শেষেই দিল্লি যাবেন ঠিক করেছেন, ট্রেনের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। দিল্লিতে ঊর্মিলার মাসির বাড়ি, সেখানে তিনি থাকতে পারবেন। পুলকেশ যাবেন না, তাঁর লেখার চাপ আছে। তা ছাড়া শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কের কারুর বাড়িতে তিনি থাকতে চান না। দু'মাস বাদে সাহিত্য আকাদেমির একটা মিটিং-এ তাঁকে দিল্লি যেতে হবে, তখন তিনি মেয়েকে দেখে আসবেন।

স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে যাওয়া হবে না বলে ঊর্মিলার মনে একটা খেদ আছে। অনেক দিন দু'জনে কোথাও বেড়াতে যাওয়াও হয় না।

স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরেই ঊর্মিলা মেয়ের প্রসঙ্গ তোলেন। দিল্লিতে এখন খুন-জখম-বোমা বিস্ফোরণ লেগেই আছে, তাই নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা।

পুলকেশ অপ্রাসঙ্গিকভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মীনাক্ষী বসুচৌধুরী বলে কারুকে চেন?

ঊর্মিলা কয়েক মুহূর্ত থেমে থেকে বললেন, তোমার কোনো প্রেমিকা? আমি চিনবো কী করে?

পুলকেশ সামান্য হেসে বললেন, আমার এত প্রেমিকা, সবার নামও মনে থাকে না! আচ্ছা, আমাদের খুকুর সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলা দেখা করতে এসেছিলেন, তাঁর মেয়েও দিল্লিতে পড়ে, খুকুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন না? বসুচৌধুরীই তো পদবী ছিল!

ঊর্মিলা বললেন, না। বসুমজুমদার। সে ভদ্রমহিলার নাম স্নিগ্ধা বসুমজুমদার, দিল্লিতে যে মেয়ে পড়ে, তার নাম দময়ন্তী।

ওয়েস্ট পেপার হাতড়ে কাগজের টুকরোটা তুলে এনে পুলকেশ আবার জিজ্ঞেস করলেন, এটা কার হাতের লেখা, তুমি কিছু বলতে পারো?

ঊর্মিলা দেখে বললেন, মনে তো হচ্ছে আমারই মতন কোনো স্কুল-টিচার। চকবাজার? সেটা আবার কোথায়?

দেরি হয়ে যাচ্ছে, পুলকেশ দ্রুত স্নান সেরে এসে খেতে বসলেন। ডাল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে পুলকেশ বললেন, দিল্লি যাওয়া-আসার খরচও তো কম নয়। সাহিত্য অ্যাকাডেমির মিটিং-এ গেলে ওরা ভাড়া দেবে, থাকার জায়গা দেবে।

ঊর্মিলা বললেন, তোমার কোনো গল্প-টল্প সিনেমা হয় না কেন? তা হলেও তো দশ-বারো হাজার টাকা পাওয়া যায়।

সকালবেলা পুলকেশের রাগ হয়েছিল, এখন হাসতে হাসতে বললেন, আজ কী হয়েছে জানো? একেই বলে মরীচিকা। আজ এক সিনেমাওয়ালা টেলিফোনে বললো....

ঊর্মিলা হাতায় করে মাছ তুলে দিচ্ছেন, আস্ত একটা সরপুঁটি মাছ, সেটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে পুলকেশ বলে উঠলেন, মীনাক্ষী! মীনাক্ষী! তোমার মনে নেই? সেই যে আমরা একবার শান্তিনিকেতনে পৌষ মেলায় গিয়েছিলাম, খুকু সঙ্গে ছিল, সেটা কবে যেন? বছর সাতেক হবে বোধহয়।

ঊর্মিলা হিসেব করে বললেন, ছয় না সাত? না, না, আট বছর, খুকু তখন স্কুলে পড়ে।

পুলকেশ বললেন, মনে নেই? সেই যে কালোর দোকানে, দুটি মেয়ে এলো—

আট বছর আগে শান্তিনিকেতনে পৌষ মেলায় দোকানে বসে সস্ত্রীক চা খাচ্ছিলেন পুলকেশ, ওঁদের মেয়ে মেলায় ঘুরছিল আর কয়েকজনের সঙ্গে, এই সময়ে দুটি যুবতী পুলকেশের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো। ওদের মধ্যে একজন হাতজোড় করে বললো, নমস্কার, আপনাকে একটা প্রশ্ন করবো? মীনাক্ষী নামের বানানে শেষেরটা দীর্ঘ-ঈ না হ্রস্ব-ই?

পুলকেশ বললেন, হঠাৎ এত লোক থাকতে আমাকে এই প্রশ্ন কেন?

সেই তরুণীটি বললো, আপনাকে চিনতে পেরেছি, আপনি লেখক পুলকেশ চট্টোপাধ্যায়।

লেখকরা বাংলা ভালো জানবেন, এটাই তো স্বাভাবিক।

পুলকেশ বললেন, লেখকদের চেয়েও অধ্যাপকরা বাংলা আরও ভালো জানে। এখানে অধ্যাপকদের ছড়াছড়ি। এটা অবশ্য তেমন কিছু কঠিন প্রশ্ন নয়।

এবারে অন্য মেয়েটি বললো, মাছের চোখের মতন চোখ, মীন প্লাস অক্ষি, এই অক্ষি বানান তো হ্রস্ব-ই।

পুলকেশ বললেন, প্রথম কথা, মাছের চোখের মতন চোখ নয়। মাছের চোখ তো গোল গোল, পলক পড়ে না। সে রকম চোখ তো বিচ্ছিরি। মাছের যে-রকম আকার, সেই আকারের চোখ। দু'দিকে সরু, মাঝখানে অনেকটা চওড়া। মীন প্লাস অক্ষি নয়, আসল কথাটা মীনাক্ষ, পুরুষের চোখ, তার থেকে স্ত্রীলিঙ্গ হয়েছে মীনাক্ষী। এবার বলুন, কে বাজি হেরেছে?

দ্বিতীয় মেয়েটি জিভ কেটে ফেললো। প্রথম মেয়েটি বললো, দেখুন না, আমার নাম মীনাক্ষী। অনেকেই বলে আমি বানান ভুল লিখি। শেষেরটা হ্রস্ব-ই হবে।

এই থেকে আলাপের শুরু। ঊর্মিলাই ওদের চা খেতে বসালেন। বেশ উচ্ছল দুই যুবতী, দ্বিতীয় জনের নাম জয়া। জয়ার তুলনায় মীনাক্ষীই সাহিত্য পড়েছে বেশি। উঠে যাবার আগে মীনাক্ষী নিজের নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে বারবার করে বলতে লাগলো, একবার আমাদের গ্রামে আসুন না। খুব ভালো লাগবে। পাশেই নদী আছে, আপনারা দু'জনেই আসবেন, থাকবার কোনো অসুবিধে নেই।

মেয়েটির চেহারাটা এখন চোখে ভাসছে না, কিন্তু ঘটনাটা সবই মনে পড়ছে। খুব আন্তরিকভাবে বারবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

ঊর্মিলা বললেন, ইস্, তখন তুমি গেলে না। তখন তোমার বয়েস কম ছিল, নাম-ডাক বেশি হয়নি বটে কিন্তু তোমার বেশ একটা হীরো হীরো ভাব ছিল।

পুলকেশ বললেন, এরকম তো কতজনই কত জায়গায় যেতে বলেছে।

—কিন্তু ঠিকানাটা তো এতদিন ধরে বেশ যত্ন করে রেখে দিয়েছো! নিশ্চয়ই তোমার মনে মনে যাবার ইচ্ছে ছিল!

—আট বছর আগে হয়তো যাবার ইচ্ছে হয়েছিল একটু একটু। কিন্তু এই কাগজটা কোথায় ছিল বলো তো? আমার কত কাগজ হারিয়ে যায়।

—কোথায় ছিল, তা তুমিই ভালো জানবে!

এই প্রসঙ্গ আর না টেনে পুলকেশ খাওয়ায় মন দিলেন। তবু তাঁর মনের মধ্যে একটা খটকা রয়ে গেল। লেখার প্যাডের ওপর এই কাগজটা এলো কী করে?

অনেক চেষ্টা করেও তিনি মীনাক্ষী নামের মেয়েটির মুখ মনে আনতে পারলেন না।

পরের শুক্রবার তিনি ঊর্মিলাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এলেন হাওড়া স্টেশনে। সেখান থেকেই বিজ্ঞাপন অফিসে এসে মন দিলেন কাজে।

এখানে অনেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে। এখানে তাঁর আলাদা একটি ঘর আছে। যারা আসে, তাদের কত রকম আবেদন। এমনকি চাকরি চেয়ে বিরক্তও করে কেউ। পুলকেশের চাকরি দেওয়ার কোনো ক্ষমতাই নেই, তবু অনেকে ভাবে, লেখকরা বুঝি সর্বশক্তিমান, তাদের মুখের একটা কথায় অনেক কাজ হয়ে যায়। এই অফিসে পুলকেশের নিজের কাজটাই যাতে চলে না যায়, সে জন্য তাকে প্রায়ই উদ্বিগ্ন থাকতে হয়।

সেইরকমই একজন চাকরির জন্য অনেকক্ষণ ধরে ঝুলোঝুলি করে তাঁর মেজাজটা বিগড়ে দিয়ে গেল। ছেলেটির যোগ্যতা আছে, চাকরিও খুব দরকার, কিন্তু পুলকেশ যে তাকে কোনো সাহায্য করতে পারবেন না, সেজন্যই তাঁর মনে একটা নিষ্ফল ক্রোধ জাগে।

এর পরের লোকটি অবশ্য একটা অপ্রত্যাশিত সুখবর দিল! এ সেই সিনেমার লোকটি, টেলিফোনে যে একদিন বিরক্ত করেছিল। আজ সে বললো, স্যার, আমার খুব ভুল হয়ে গেছে, আপনার গল্পই আমরা ফিল্ম করবো ঠিক করেছি। চিত্রনাট্য লেখাও শুরু হয়ে গেছে, সেদিন গল্পের নামটা গোলমাল করে ফেলেছিলাম। 'দংশন', 'দংশন', আপনার লেখা নয়?

দর-দস্তুরও ঠিক হয়ে গেল, এমনকি লোকটি দু'হাজার টাকা অগ্রিমও দিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে। প্রায় সাত বছর বাদে সিনেমা থেকে পুলকেশের এই উপার্জন। অনেক সময় চুক্তি-টুক্তি হবার পরও শূটিং আর শুরুই হয় না। তা হোক বা না হোক, তবু তো ফালতু এই দু'হাজার টাকা পাওয়া গেল।

এর পর দু'জন লোক এলো সভা-সমিতির ব্যাপারে।

'প্রধান অতিথি'র ব্যাপারটা কবে থেকে চালু হয়েছে কে জানে। আজকাল সব সভা-সমিতিতে সভাপতি ছাড়াও একজন প্রধান অতিথি থাকবেই। তার কাজ হলো কিছুক্ষণ ধরে এলোমেলো বক্তৃতা দেওয়া। লোকে কেন এত বক্তৃতা শুনতে ভালোবাসে? যে জাতি যত নিষ্কর্মা হয়, সে জাতির মধ্যে তত বক্তৃতার তোড় বাড়ে।

পুলকেশ হাতজোড় করে বললেন, আমি যেতে পারছি না, মাপ করবেন!

এত সহজে এরা ছাড়ে না। তিন-চারজন লেখকের নাম ঠিক করে আসে, নৈবদ্যর ওপর বাতাসার মতন একজন প্রধান অতিথি চাই-ই চাই। নিতান্ত খুব অসুস্থ কিংবা মেয়ের বিয়ের মতন গুরুতর কাজ দেখাতে না পারলে যেতেই হবে।

লোক দুটি বললো, আমরা ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটে নিয়ে যাবো স্যার।

লোভ দেখাচ্ছো? পুলকেশের বলতে ইচ্ছে হলো, আমি জীবনে বুঝি ফার্স্ট ক্লাসে চাপিনি? কিছু না বলে শুধু মাথা নাড়লেন।

লোক দুটি আবার বললো, আপনার কোনো কষ্ট হবে না, যেদিন যাবেন, পরের দিন চলে আসবেন। সব ব্যবস্থা করা থাকবে।

এরকম কথা সবাই বলে। দু'দিন যে সময় নষ্ট হবে, তার দাম কে দেবে? কোনো গাইয়ে-বাজিয়ে-নাচিয়েকে মফস্বলে নিয়ে যেতে গেলে অনেক টাকা লাগে, লোকে দেয়ও, কিন্তু কোনো সাহিত্যিককে টাকার কথা উচ্চারণ করতে নেই। প্রধান অতিথিকে দেওয়া হয় একটি ফুলের তোড়া, যেটা আসবার সময় ফেলে রাখতে হয়।

লোক দুটি সমানে একই কথা বলে যাচ্ছে, পুলকেশও সম্ভব নয়, সম্ভব নয় বলে যাচ্ছেন।

ওরা সঙ্গে একটি চিঠি এনেছে। পুলকেশ চিঠিটা ভালো করে পড়েও দেখেননি। সব চিঠিই তো একই রকম হয়। একটা স্কুলের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠান। সেখানে একজন লেখকের যাবার কী দরকার? দুটি দিন খরচ করে লেখকটির কী উপকার হবে?

হঠাৎ চিঠিটার দিকে আর একবার চোখ পড়তে তিনি চমকে উঠলেন।

প্যাডের ওপরে ছাপা, ব্রজেশচন্দ্র গার্লস স্কুল, চকবাজার, বীরভূম।

মীনাক্ষী নামের সেই মেয়েটি এই স্কুলেই পড়ায় না? কয়েকদিন আগে তার ঠিকানা লেখা কাগজটাই তো কোথা থেকে উড়ে এসেছিল। অদ্ভুত কাকতালীয় যোগাযোগ।

সেদিন যে-টেলিফোন পেয়ে পুলকেশ বিরক্ত হয়েছিলেন, আজ তার সুফল পাওয়া গেছে, সিনেমার লোকেরা টাকা দিয়ে গেল। কাগজের টুকরোটার সঙ্গে যেন এর একটা যোগ আছে।

পুলকেশ মন বদলে ফেললেন। মীনাক্ষী চকবাজারে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। নিশ্চয়ই পুলকেশকে দেখলে খুশিই হবে। ঊর্মিলা দিল্লি গেছে, পুলকেশ এর মধ্যে দু'দিনের জন্য বাইরে ঘুরে এলে মন্দ কী? একটা নতুন জায়গা দেখা হবে। ওখানে কী যেন একটা নদী আছে।

পুলকেশ লোক দুটিকে বললেন, ঠিক আছে, আপনারা এত করে যখন বলছেন, আমি যাবো, কিন্তু আপনাদের চকবাজারে কি কোনো বাংলো বা গেস্ট হাউজ আছে? রাত্তিরটা থাকবো কোথায়? কোনো লোকের বাড়িতে থাকতে আমার অস্বস্তি হয়।

লোক দুটি হাতে যেন স্বর্গ পেল। আর কোনো লেখকের কাছে গিয়ে ওদের ঝুলোঝুলি করতে হবে না।

তারা বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার, সব আছে। চকবাজারকে ছোট জায়গা ভাববেন না। ইরিগেশানের বাংলো আছে, হোটেল আছে, তাহলে স্যার সামনের শনিবারে, সকাল সাড়ে সাতটায় ট্রেন, আমরা একজন এসে নিয়ে যাবো—

লোক দুটি চলে যাবার পর পুলকেশ মীনাক্ষী বসুচৌধুরীর মুখখানা মনে করার খুব চেষ্টা করলেন। মেয়েটির দাঁড়াবার ভঙ্গিটা পর্যন্ত মনে আছে, কিন্তু মুখটা মুছে গেছে একেবারে।

।। ২।।

শুক্রবার রাতে খুব একচোট ঝড়-বৃষ্টি হওয়ায় সকালটি বেশ মনোরম। ট্রেনে বই পড়তে পড়তে সময়টা কাটিয়ে দিলেন পুলকেশ।

স্টেশনে তিন চারজন পুরুষ ও একজন মহিলা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য উপস্থিত। পুলকেশ আশা করেছিলেন মীনাক্ষীও আসবে। মীনাক্ষীর মুখটা মনে না থাকলেও যে ভদ্রমহিলা এসেছেন, তিনি মীনাক্ষী হতে পারেন না।

নামও জানা গেল, এই মহিলার নাম সবিতা দাস, এখানকার মেয়েদের স্কুলের হেড মিস্ট্রেস। একই বিল্ডিং-এ সকালে মেয়েদের স্কুল, দুপুরে ছেলেদের। এ তথ্যও জানা গেল।

আরও যে ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হলো, তাঁদের নাম তখুনি ভুলে গেলেন পুলকেশ। এঁরা এখানকার হোমরা-চোমরা লোক। একজন চালকলের মালিক।

সেই চালকলের মালিকের গাড়িতেই তোলা হলো পুলকেশকে। বেশ হৃষ্টপুষ্ট মাঝবয়েসী মানুষটির মাথায় টাক, পুরুষ্ট গোঁফ, গায়ের রং বেশ ফর্সা। যেতে যেতে তিনি বললেন, তাঁরই বাড়িতে মাননীয় সাহিত্যিকের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। তাঁর ছোট মেয়ে খুব গল্পের বই-টই পড়ে।

পুলকেশ একটু বিরক্ত হলেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে কারুর বাড়িতে থাকবেন না, গেস্ট হাউসের ব্যবস্থার কথা ঠিক ছিল। প্রথমেই কথার খেলাপ? কারুর বাড়িতে থাকতে গেলে সে বাড়ির কতকগুলো নিজস্ব নিয়ম আছে তা মানতে হয়। খাওয়া-দাওয়ার অত্যাচার বেশি হয়, কোনো কোনো বাড়িতে বাবা-জ্যাঠা ধরনের কোনো বৃদ্ধ লোক এসে একটানা কথা বলতে শুরু করে।

পুলকেশ জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কোনো সরকারি বাংলো কিংবা গেস্ট হাউজ নেই?

ভদ্রলোক বললেন, একটা আছে পি ডব্লু ডি'র বাংলো, সেখানে এস ডি ও সাহেব এসে উঠেছেন, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী আছেন।

পুলকেশ ভাবলেন, এস ডি ও মানে একজন তরুণ আই এ এস কিংবা ডব্লু বি সি এস অফিসার। সে এসেছে বলে একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের জায়গা হবে না। সরকারি পদাধিকারের জোর! এখনো এস ডি ও'রা সাহেব হয়।

চালকল মালিকটি বললেন, আমার বাড়িতে গেস্ট রুম আছে, অনেক বড় বড় লিডার এসে থেকে গেছে, আপনার কোনো অসুবিধে হবে না দেখবেন।

পুলকেশ চুপ করে থেকে মনে মনে বললেন, আমার কিসে সুবিধে আর কিসে অসুবিধে, তা অন্য লোকে বুঝবে কী করে? রান্নার সময়ের গন্ধ আমার খারাপ লাগে, ডালে মিষ্টি দিলে আমার খারাপ লাগে, মাছ বেশি কড়া করে ভাজলে পছন্দ হয় না।

এসব কথা গেস্ট হাউজ কিংবা হোটেলে থাকলে জানিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু কারুর বাড়িতে থাকলে বলা যায় না।

বাড়িটি বেশ বড়, দোতলা এবং অনেকখানি ছড়ানো, একটা টানা বারান্দার এক কোণের ঘরটি দেওয়া হলো পুলকেশকে। সঙ্গে বাথরুম আছে। বাড়ির সামনে একটা এলোমেলো ধরনের বাগান, তা ছাড়া গোয়ালঘর, হাঁস-মুর্গির ঘর সবই আছে।

খাট ছাড়া ঘরে একটিমাত্র চেয়ার। পুলকেশ সেই চেয়ারে বসতেই হুড়মুড় করে সাত-আটজন লোক ঢুকে পড়লো। এদের মধ্যে একজন বেশ পাণ্ডা গোছের, তার নাম আদিনাথ গায়েন, তার হাতে একটি কাগজ, সে অন্য সকলের নাম ও পরিচয় বলে গেল, কেউ ক্লাবের সেক্রেটারি, কেউ বাংলা-শিক্ষক, কেউ পঞ্চায়েত প্রধান। এত নাম মনে রাখার কোনো দায়িত্ব নেই পুলকেশের।

তবে এ বাড়ির মালিকের নামটা আর একবার শোনা দরকার। যাঁর বাড়িতে আতিথ্য নিয়েছেন তাঁর নামটা জানা উচিত।

আদিনাথ বললো, স্যার, আপনার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে, হাত মুখ ধুয়ে নিন, খাবার রেডি। তিনটের সময় এখানকার কিছু লোক আসবেন আপনার সঙ্গে আলাপ করতে। সবাই আমাকে আগেই বলে রেখেছে। চারটে থেকে স্কুলের মাঠে মিটিং, প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশানে আপনার হাত দিয়ে প্রাইজগুলো দেওয়া হবে, ওয়েস্ট বেঙ্গলের একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র, তিনি দেবেন স্পোর্টসের প্রাইজ, তারপর আপনাদের ভাষণ। ইয়ে, মিটিং শেষ হলে স্যার রমেশ সিকদারের বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন, উনি হাঁটতে পারেন না বলে ফাংশানে যেতে পারবেন না। আপনাকে বিশেষ করে যেতে বলেছেন। খুব বই পড়েন, রাত্তিরের ডিনারটা স্যার আমার বাড়িতে, অবশ্য ডাক্তারবাবুও খুব করে বলছেন।

এখন দুপুর সওয়া দুটো। খেয়ে উঠতে না উঠতেই তিনটে বেজে যাবে, তখন এক দঙ্গল লোকের সঙ্গে বকবক করতে হবে। পুলকেশ একটা বিরক্তির দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন। এখানে এসে পড়েছেন যখন, একটা দিন এদের কথামতন মেনে চলতেই হবে, উপায় নেই।

আদিনাথ ছাড়া অন্য লোকগুলি একটা কথাও বলছে না। চিড়িয়াখানার নতুন কোনো প্রাণীর মতন এরা একজন সাহিত্যিক দেখতে এসেছে।

খাওয়ার ঘরে গিয়ে পুলকেশ থমকে দাঁড়ালেন। দৃশ্যটি চমৎকার। একটি কারুকার্য করা লাল পশমের আসন পাতা মেঝেতে। মস্ত বড় একটা কাঁসার থালায় পরিপাটি করে ভাত সাজানো। থালাটাকে ঘিরে অন্তত আট-দশটি তরকারি, মাছের বাটি।

এরকম দৃশ্য আজকাল শুধু সিনেমাতেই দেখা যায়। পঞ্চাশ বছর আগে এটা মানাতো। পুলকেশ বহুদিন মেঝেতে বসে খাননি।

একটাই জায়গা করা হয়েছে দেখে পুলকেশ বললেন, এ কী, আর কেউ খাবেন না?

আদিনাথ বলে উঠলো, না, না, স্যার, আপনি বসুন, আপনি বসুন!

আপত্তি করে লাভ নেই। পুলকেশ একা একা খাবেন, আর একদল লোক হাঁ করে দেখবে, এটা একটা বিসদৃশ ব্যাপার। সবাই একসঙ্গে বসলে কী ক্ষতি ছিল? এত বেশি খাতির পুলকেশের সহ্য হয় না।

বাড়ির মেয়েদের প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে না। শুধু একটি বারো-তেরো বছরের মেয়ে ফ্রকের ওপর শাড়ি জড়িয়ে পরিবেশন করতে এলো। আড়ালে মহিলা কণ্ঠের ফিসফিসানি শোনা যাচ্ছে।

একটু ভাত ভেঙে ডাল দিয়ে মেখে একটা গেরাশ মুখে দিলেন পুলকেশ। যা আশঙ্কা করেছিলেন, ঠিক তাই। ডালে প্রচুর মিষ্টি। বেগুন ভাজা, মাছ ভাজা কনকনে ঠাণ্ডা। গরম গরম বেগুন ভাজার স্বাদ যে একেবারে আলাদা, তা এরা জানে না। ঠাণ্ডা মাছ ভাজা পুলকেশ মুখে ছোঁয়াতেই পারেন না।

তিনি কিশোরী মেয়েটিকে বললেন, এতগুলো বাটি, আমি তো সব খেতে পারবো না!

মেয়েটির বদলে আদিনাথ বললেন, সব আপনাকে টেস্ট করতেই হবে স্যার।

এ বাড়ির মালিক, এতক্ষণে তাঁর নামটা আবার উদ্ধার করা গেছে, ভুবন সরকার। তিনি বললেন, আমার স্ত্রী নিজের হাতে সব রেঁধেছেন, ভোর পাঁচটা থেকে দেখি যে রান্নাঘরে, আপনি না খেলে তিনি দুঃখ পাবেন না!

যত্নের কোনো ত্রুটি নেই। কিন্তু ঠাণ্ডা খাবার পুলকেশের কাছে একেবারে অখাদ্য। গেস্ট হাউজে উঠলে তিনি বলতে পারতেন, সব আবার গরম করে নিয়ে এসো।

তিনি লাজুক মুখ করে বললেন, আমি বেশি খেতে পারি না। রান্না খুব ভালো হয়েছে।

আঁচিয়ে ওঠার পর বহুদিন পর একটা পান খেলেন পুলকেশ। তাঁদের বাড়িতে পানের চল নেই, উর্মিলা পান সহ্য করতে পারেন না।

ঘরে ফিরে এসে আবার তাঁর মেজাজ বিগড়ে গেল। চেয়ারটি খালি রেখে খাটের ওপর বসে আছে ছ'সাতটি প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ। পুলকেশের ইচ্ছে ছিল খাটে কিছুক্ষণ গড়িয়ে নেওয়ার। এখন তো এই লোকগুলোকে খাট থেকে উঠতে বলা যায় না।

বিছানার ওপর একদল লোক বসে ধ্যাস্টালে সেই বিছানায় রাত্তিরে শুতে ইচ্ছে করে?

এর পর ঘণ্টাখানেক ধরে যে-সব কথাবার্তা চললো, তাতে পুলকেশের কোনো বই বা কোনো এক লাইন রচনারও উল্লেখ করলো না কেউ। এরা কেউ পুলকেশের লেখা কিছুই পড়েনি। পুলকেশ একজন সাহিত্যিক, সেই পরিচয়টাই যথেষ্ট। এদের ধারণা, কলকাতার সাহিত্যিকদের অনেক ক্ষমতা।

এই গ্রামে কোনো হেল্‌থ সেন্টার নেই, চিকিৎসার খুব অসুবিধে, কয়েকজন বারবার অনুরোধ জানাতে লাগলো, পুলকেশ যেন খবরের কাগজে সে বিষয়ে লেখে দেন। যেন

তিনি লেখলেই গভর্নমেন্ট ভয় পেয়ে এখানে হেল্‌থ সেন্টার বানিয়ে দেবে। একজন খুনখুনে বুড়ো বারবার উপদেশ দিতে লাগলেন, ও মশাই, আপনি তো রাইটার, এই যে আজকালকার ছেলেমেয়েরা বিয়ে করতেই চায় না, ধেই ধেই করে ঘুরে বেড়ায়, এই নিয়ে লিখুন। দেশটা যে উচ্ছন্নে যাচ্ছে। আমার নাতনীটার বিয়ে ঠিক করলুম, তা সে বেঁকে বসলো, এখন বিয়ে করবে না। আমাদের কালে আমরা বাপ-ঠাকুর্দার মুখের দিকে তাকিয়ে কথাও বলতে সাহস পেতুম না, আর এখন মেয়েরাও। সে জোর করে বর্ধমানে গিয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে। কী খায়, কার সঙ্গে মেশে কে জানে!

পুলকেশ হাই তুলতে তুলতে ভাবলেন, যতদূর দেখা যাচ্ছে, এরা কেউ তাঁর একটাও লেখা পড়েনি। তবু তাঁকে এখানে প্রধান অতিথি করে আনার বুদ্ধিটা কার মাথায় এলো? মীনাক্ষী বসুচৌধুরী? কিন্তু সে কোথায়? এখনো পর্যন্ত সে একবারও দেখা দিল না!

প্যান্ট-শার্ট বদলে পুলকেশ ধুতি-পাঞ্জাবি পরে নিলেন অনুষ্ঠানের জন্য। মফস্বলের দিকে প্যান্ট পরা প্রধান অতিথি মানায় না।

কিন্তু মঞ্চে উঠে দেখলেন, স্বয়ং সভাপতি সাফারি স্যুট-পরা। মফস্বল যে কত এগিয়ে গেছে, তা তিনি জানেন না। ধুতি-পরা লোক খুব কমই দেখা যাচ্ছে।

সভাপতি একজন রিটায়ার্ড পুলিশের দারোগা। সত্তরের কাছাকাছি বয়েস হলেও বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। মুখ দেখলেই বোঝা যায়, বেশ পয়সা-কড়ি আছে, এখনো লোকের ওপর অধিকার খাটাতে জানেন। খানিকটা পিঠ চাপড়ানো সুরে তিনি বললেন, আসুন, আসুন, কোনো কষ্ট হয়নি তো? কলকাতায় আপনার বাড়ি কোথায়? আমার মেয়ে-জামাই থাকে সল্টলেকে, কলকাতায় আমি প্রায়ই যাই।

অনুষ্ঠানের প্রথম অংশে গুণীজন সংবর্ধনা। মঞ্চে আরও দু'জন ব্যক্তি বসে আছে। ঘোষকের কথা অনুযায়ী জানা গেল, তাদের একজন ডাক্তার, তার নাম বিকাশ নন্দী, আর একজন মানিক বিশ্বাস নামে ফুটবল খেলোয়াড়। একটি শাল, একটি ছোট রুপোর থালা আর একটি করে ফুলের তোড়া দেওয়া হলো ওদের দু'জনকে।

পুলকেশ চমকে উঠলেন, যখন ওরকম একটি করে শাল, রুপোর থালা ও ফুলের তোড়া তাঁকেও দেওয়ার জন্য ডাক পড়লো। বাইরের কোনো অনুষ্ঠানে লেখকদের নিয়ে গেলে তাঁদের জন্য শুধু ট্রেন ভাড়া খরচ করা হয়, আর কিছু না। ফুলের তোড়াটা বিনামূল্যে পায় নিশ্চয়ই। এখানে শাল, আবার রুপোর থালা! একজন ডাক্তার ও একজন ফুটবল খেলোয়াড়ের সঙ্গে একজন সাহিত্যিককেও যে এরা গুণীজন হিসেবে গণ্য করেছে, তা খুবই আশ্চর্যের বলতে হবে।

একটি চেয়ার খালি। রাষ্ট্রমন্ত্রী এখনো এসে পৌঁছোননি, বহরমপুর থেকে তিনি গাড়িতে আসবেন, যে-কোনো সময়ে এসে পড়তে পারেন। স্কুলের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে ভাষণ দিতে লাগলেন সেক্রেটারি। সে ভাষণ অনেকক্ষণ চললো।

পুলকেশের পাশেই বসেছে ডাক্তারটি। বেশ সুপুরুষ, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়েস,

সাদা জামা-সাদা প্যান্ট পরা, মুখে বুদ্ধির ছাপ আছে। ওদিকে বক্তৃতা চলছে, সে পুলকেশকে বললো, নমস্কার, আমি ছাত্র বয়েস থেকেই আপনার লেখা পড়েছি, এখন বিশেষ সময় পাই না, আমার বাড়িতে আপনার লেখা দু'তিনখানা বই আছে।

এই প্রথম একজনের মুখে পুলকেশ নিজের লেখার কথা শুনলেন।

ডাক্তারটি বললো, আপনার একটা বই, 'শেষের পর শেষ নেই', আমার দারুণ লেগেছিল। কয়েকজনকে উপহারও দিয়েছি বইটা।

বইয়ের নামও বলতে পারলো, এ লোকটি খাঁটি পাঠক। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারটিকে পছন্দ করে ফেললেন পুলকেশ। লেখকদের এ দুর্বলতা তো থাকেই।

এর পর বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পুলকেশকে পুরস্কার বিতরণ করতে হলো। তারই ফাঁকে ফাঁকে তিনি দর্শকদের মুখগুলো দেখতে লাগলেন ভালো করে। মীনাক্ষী নামের মেয়েটি গেল কোথায়? তার মুখটা মনে না থাকলেও দেখলে নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন পুলকেশ। সে নিজে থেকে একবারও দেখা দিল না।

প্রায় দুশো-আড়াইশো জন দর্শক। নানা বয়েসের মহিলাও রয়েছে পনেরো-কুড়িজন, তাদের কারুকেই মীনাক্ষী বলে মনে হয় না। কোথায় গেল সে? অনেকটা মীনাক্ষীর জন্যই তো পুলকেশ এখানে আসতে রাজী হয়েছেন।

ওঃ হো, এমনও তো হতে পারে, মীনাক্ষী এখানে আর নেই। এই স্কুল ছেড়ে অন্য কোনো স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে গেছে। কিংবা বিয়ে করে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। আট বছর আগে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এর মধ্যে কত কী ঘটে যেতে পারে।

সে এখানে থাকলে নিশ্চয়ই এতক্ষণে দেখা হয়ে যেত।

পুরস্কার বিতরণের পর, পুরস্কারপ্রাপ্ত ছটি ছেলেমেয়ে আবৃত্তি করে শোনাবে। ডাক্তার বিকাশ নন্দী বললো, আমি বেশিক্ষণ বসতে পারবো না, আমার চেম্বার আছে। আপনি কালই চলে যাচ্ছেন? খুব ইচ্ছে ছিল আমার বাড়িতে আপনাকে আজ রাত্তিরে ডাকবো। কিন্তু শুনলুম আগে থেকেই অন্যরা বুক করে ফেলেছে।

বিকাশ নন্দী উঠে যাবার পর পুলকেশও উসখুস করতে লাগলেন। মঞ্চে বসে সিগারেট খাওয়া যায় না। ঘন্টা দেড়েক কেটে গেছে এরই মধ্যে, আরও কতক্ষণ চলবে কে জানে।

তিনি সভাপতিকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি একটু বাইরে থেকে আসবো?

তিনি সম্মতি দিতেই পুলকেশ চলে এলেন মঞ্চের পেছনে। তখনই আদিনাথ এসে জিজ্ঞেস করলো, বাথরুমে যাবেন স্যার?

পুলকেশ মাথা নাড়লেন।

—জল খাবেন?

এবারেও মাথা নেড়ে পুলকেশ সিগারেটের প্যাকেটটা বার করতে গেলেন পাঞ্জাবির

পকেট থেকে। আদিনাথ ফস করে নিজের একটা প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বললো, এটা থেকে খান!

পুলকেশ বললেন, ধন্যবাদ। আমি নিজের ব্র্যান্ডটা ছাড়া অন্য সিগারেট খেতে পারি না।

আদিনাথকে এড়িয়ে তিনি সরে গেলেন এক কোণে। নিরিবিলি হলে সিগারেট টেনে বেশি স্বাদ পাওয়া যায়।

কলকাতায় এরকমভাবে মঞ্চের পেছনে দাঁড়ালে অনেক ছেলেমেয়ে অটোগ্রাফের জন্য ছুটে আসতো। এখানে সে ব্যাপারটা নেই দেখা যাচ্ছে।

বাইরে থেকে তিনটি রমণী উঠে এলো এদিকে। পুলকেশের থেকে একটু দূরে দাঁড়ালো। যেন তারা কিছু বলতে চায়, অথচ লজ্জা পাচ্ছে।

পুলকেশের সঙ্গে চোখাচোখি হতে ওদের একজন বললো, আমরা আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি কী?

পুলকেশ বললেন, আসুন।

তিনজন একইরকম নীল শাড়ি পরা। বয়েসও কাছাকাছি মনে হয়, পঁয়তিরিশ-ছত্রিশের মধ্যে। খুব সম্ভবত স্কুলের শিক্ষয়িত্রী।

চশমা-পরা মহিলাটি বললো, আমরা এই স্কুলে পড়াই।

পুলকেশ স্মিত হাসলেন। তাঁর আন্দাজ ঠিক মিলে গেছে।

মহিলাটি আবার বললো, আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে। আমরা কয়েকজন এই কাছেই একটা বাড়িতে মেস করে থাকি। ফাংশান হয়ে গেলে একবার সেখানে যাবেন? আমাদের সঙ্গে একটু চা খাবেন, গল্প করবেন!

পুলকেশ বললেন, আমার তো আপত্তি নেই। কিন্তু উদ্যোক্তারা অন্য কোথায় যেন চায়ের ব্যবস্থা করেছে।

মহিলাটি বললো, তাতে কী হয়েছে! আপনি দু'বার চা খেতে পারবেন না?

পুলকেশ বললেন, তাও খেতে পারি। উদ্যোক্তারা যদি আপত্তি না করে....বাইরে এলে আমাদের ঠিক স্বাধীনতা থাকে না, এরা যেখানে নিয়ে যায়।....

মহিলাটি বললো, তা বলে আমরা বুঝি আপনার সঙ্গে একটু গল্প করার চান্স পাবো না? আপনি শুধু বড় বড় লোকদের সঙ্গে মিশবেন?

পুলকেশ এবার সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললেন, আমাকে এক্ষুণি নিয়ে চলুন না। আমি পালিয়ে যেতেও রাজী আছি। আপনাদের সঙ্গে গল্প করতেই আমার ভালো লাগবে।

তিন রমণী হাসতে হাসতে এ ওর কাঁধে মাথা ছোঁয়ালো।

একজন বললো, ওরে বাবা, এখন নিয়ে গেলে হৈহৈ পড়ে যাবে। আপনার বক্তৃতা শেষ হলে বরং....আমরা এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবো।

পুলকেশ বললেন, আপনাদের নাম জানা হলো না।

দীপিকা সরকার, নীতিসুধা দাস আর জয়া দাশগুপ্ত। তিনজনে হাত তুলে নমস্কার জানালো। তারপর জয়া নামের মেয়েটি বললো, আপনার সঙ্গে আমার একবার আলাপ হয়েছিল, অনেক বছর আগ, আপনার মনে থাকবার কথা নয়।

পুলকেশ জিজ্ঞেস করলেন, তাই নাকি? আলাপ হয়েছিল? কোথায়?

—শান্তিনিকেতনে। সাত-আট বছর হয়ে গেল।

—শান্তিনিকেতনে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে। আপনার সঙ্গে আর একজন ছিল, তার নাম মীনাক্ষী বসুচৌধুরী, তাই না? সে এখন কোথায়?

তিনজনেরই মুখ হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল। এ ওর মুখের দিকে তাকালো। প্রায় এক মিনিটের অস্বস্তিকর নীরবতার পর জয়া ভাঙা ভাঙা গলায় বললো, সে আর বেঁচে নেই।

দীপিকা বললো, এই তো মাত্র কুড়ি পঁচিশ দিন আগে।

পুলকেশ এর পর আর কথা খুঁজে পেলেন না। অতি সামান্য চেনা, হঠাৎ এতদিন পর ঠিকানা লেখা কাগজটা আবার বেরিয়ে না এলে নামটাও মনে থাকতো না। তবু পুলকেশ খানিকটা কষ্ট বোধ করলেন।

আর কিছু কথা বলার সুযোগও পাওয়া গেল না, আদিনাথ হন্তদন্ত হয়ে এসে বললো, স্যার, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে....সিগারেট খাওয়া হয়ে গেছে? মিনিস্টার এসে গেছেন, চলুন, চলুন—

আবার মঞ্চে এসে বসতে হলো পুলকেশকে। বক্তৃতার পর বক্তৃতা চললো। প্রধান অতিথির ভাষণ সবচেয়ে শেষে রাখা হয়েছে। তাঁকে পয়সা খরচ করে আনা হয়েছে, টপ করে বক্তৃতা দিয়ে চলে যাবেন, তা তো হয় না।

পুলকেশ কিছুই শুনছেন না। স্কুলের অনুষ্ঠান হলেও ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি নগণ্য, এখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই এসেছেন। এক একটা বক্তৃতা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের কমে শেষ হয় না। একই কথা বিভিন্ন জন বলে, এমনকি ঘোষকটিই মাইক পেলে ছাড়তে চায় না, এক একটি ঘোষণার আগে মিনিট পাঁচেক আবোল-তাবোল বকে।

পুলকেশ সামনে তাকিয়ে যেন কিছু দেখতেও পাচ্ছেন না। মীনাক্ষী নামে একটি মেয়ে নেই, তাই সব যেন শূন্য হয়ে গেছে। মাত্র কুড়ি-পঁচিশ দিন আগেই সে মারা গেছে? ঠিক সেই সকালেই ঠিকানা লেখা কাগজটা কোথা থেকে উড়ে এসে পড়েছিল। সেই দিনটাই কি ছিল তার মৃত্যুদিন?

॥ ৩ ॥

সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে পুলকেশ মাত্র সাত-আট মিনিটে তাঁর ভাষণ শেষ করে দিলেন। তিনি বক্তা নন, তিনি লেখক।

সভা শেষ হবার পর উদ্যোক্তারা যখন মন্ত্রীমশাইকে নিয়ে ব্যস্ত, সেই ফাঁকে তিনি চলে এলেন মঞ্চের পেছনে। তিন রমণী সেখানে ঠিকই দাঁড়িয়ে আছে। পেছনের মাঠ দিয়ে তিনি হেঁটে গেলেন ওদের সঙ্গে।

একটা সাদা রঙের দোতলা বাড়ি, পাঁচ-ছ'খানা ঘর। এখানে মেয়েদের হস্টেল নেই, যে-সব শিক্ষিকারা বাইরে থেকে চাকরি করতে এসেছেন, তাঁরা এই বাড়িতে একসঙ্গে থাকেন।

দোতলায় ভেতর দিকে একটা ঘেরা বারান্দায় বসার জায়গা। ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে টেবিল। চায়ের সঙ্গে সিঙারা ও দু'তিন রকম মিষ্টি। হেড মিস্ট্রেস ও আরও দু'তিনজন শিক্ষিকা উদ্যোক্তাদের সঙ্গে রয়ে গেছেন, এখানে উপস্থিত যে পাঁচজন, তারাই সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে আগ্রহী। নানারকম প্রশ্ন করা হচ্ছে পুলকেশকে।

জয়া একসময় বললো, আমাদের মধ্যে মীনাক্ষীই কিন্তু আপনার বেশি বই পড়েছে। ও আপনার বই যোগাড় করে এনে দিত।

পুলকেশ জিজ্ঞেস করলেন, সে আর নেই, তার কী হয়েছিল?

সবই হঠাৎ উৎকটভাবে নীরব হয়ে গেল। একজন নেমে গেল একতলায়। কেউ কোনো উত্তর দেয় না।

পুলকেশ জয়ার চোখে চোখ রাখলেন।

জয়া চোখ নামিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বললো, সে আত্মহত্যা করেছে।

আত্মহত্যার কথা শুনলেই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, কেন? কিন্তু এর কি কোনো উত্তর পাওয়া যায়? এমন সব অতি ব্যক্তিগত কারণে মানুষ আত্মহত্যা করে, যা অন্য কারুর পক্ষে বোঝাই সম্ভব নয়।

পুলকেশ তবু জিজ্ঞেস করলেন, কোথায়? এখানেই?

এবারে দীপিকা বললো, হ্যাঁ, এখানেই, মানে, এই বাড়িতে নয়। রাত্তিরবেলা নদীর ধারে গিয়ে শুয়েছিল, অনেকগুলো ঘুমের বড়ি খেয়ে।

হ্যাঁ, এখানে একটা নদীর কথা মীনাক্ষীই বলেছিল। নদীর ধারে সে শুয়েছিল ঘুমের ওষুধ খেয়ে, মেয়েটি রোমান্টিক ছিল খুব। বেশি বয়েস তো নয়, তবু সে চলে গেল কেন পৃথিবী ছেড়ে?

জয়া বললো, আসুন, আপনাকে ঘরটা দেখাই।

ডানদিকের কোণের ঘরটায় দুটো খাট পাতা। একটাতে বিছানা নেই। জানলা দিয়ে অনেকখানি খোলা প্রান্তর দেখা যায়। একটা টেবিলে অনেক বইপত্র ছড়ানো। একটা খাতা এখনো খোলা রয়েছে।

জয়া বললো, আমি আর ও এই ঘরে থাকতুম একসঙ্গে। এখন খালি পড়ে থাকছে। আমরা কেউ শুই না।

পেছন থেকে একজন বললো, জয়া রাত্তিরে ভয় পায় এখানে শুতে।

জয়া বললো, আহা-হা, তুই এখানে শুলেই পারিস! তোকেও তো বলেছি!

পুলকেশের দিকে ফিরে জয়া আবার বললো, যদিও লজ্জার কথা, তবু স্বীকার করছি। মীনাক্ষী আমাদের খুব বন্ধু ছিল, কারুর সঙ্গে ওর ঝগড়া হয়নি কখনো, আমাকে

তো ও ওর মনের কথা সবই বলতো। তবু জানেন, রাত্তিরবেলা এঘরে আসতে ভয় ভয় করে। খালি মনে হয়, এই বুঝি দেখতে পাবো, মীনাক্ষী খাটে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে, কিংবা চিঠি লিখছে। অবশ্য কোনোদিনই কিছু দেখিনি। আমার ওসবে বিশ্বাসও নেই।

পেছন থেকে আর একজন বললো, আমি কিন্তু একদিন দেখেছি। বাথরুমে। আমায় দেখে ঠোঁটে আঙুল দিল, তারপর মিলিয়ে গেল।

জয়া ধমকে বললো, বাজে কথা বলিস না। তুই তো আগেও এরকম কতবার দেখেছিস। ভূত দেখা তোর বাতিক।

দেয়ালে একটা গ্রুপ ছবি টাঙানো। মোট পাঁচটি রমণী, মাঝখানেরটির দিকে আঙুল দেখিয়ে জয়া বললো, এই যে মীনাক্ষী, চিনতে পারছেন?

পুলকেশ কাছে এগিয়ে ভালো করে দেখলেন।

খুব একটা সুন্দরী না হলেও মুখে একটা আলগা মাধুর্য আছে। চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। দেখা মাত্র মেয়েটির ছটফটে ভঙ্গিটা মনে পড়ে গেল।

জয়া বললো, আপনার যে কী ভক্ত ছিল আপনি জানেন না। প্রত্যেকদিন অন্তত একবার আপনার নাম বলবেই! আপনার ওপরে ওর রাগও ছিল। আপনাকে একবার চিঠি লিখেছিল, আপনি উত্তর দেননি!

পুলকেশ চমকে উঠে বললেন, তাই নাকি?

জয়া বললো, হ্যাঁ, সেই আপনার সঙ্গে দেখা হবার পরের মাসেই। ওর খুব বিশ্বাস ছিল, আপনি উত্তর দেবেনই। এক মাস পরেও উত্তর এলো না, ও কেঁদে ফেলেছিল। কিন্তু আপনার বইপড়া ছাড়েনি। সব বই তো পড়তোই, একদিন আমাকে বলেছিল, এখনো আমি পুলকেশ চট্টোপাধ্যায়কে মনে মনে চিঠি লিখি!

পুলকেশ অপরাধবোধ করলেন। সব চিঠির না হলেও অনেক চিঠিরই তিনি উত্তর দেন। বিশেষত মেয়েদের চিঠি অগ্রাহ্য করেন না। মেয়েরা মনোযোগী পাঠিকা, মেয়েরা ভালো চিঠি লিখে।

কিন্তু অনেক সময় এমন হয়, তিনি বাইরে কোথাও চলে যান, এক মাস-দেড় মাস বাদে ফিরলে বেশ কিছু চিঠি জমে যায়। সেগুলোর উত্তর দেব দেব করতে করতেই আরও চিঠি আসে, আরও অন্য কাজ পড়ে যায়। তখন পুরোনো চিঠির উত্তর দেওয়াটাই অবান্তর হয়ে যায়। নিশ্চয়ই সে রকম কিছু হয়েছিল। সেবারে শান্তিনিকেতন থেকে ফেরার পর তিনি আবার কোথায় গিয়েছিলেন! এখন মনে পড়ছে না। মীনাক্ষীর চিঠিটার কথাও মনে নেই।

জয়া বললো, ও আরও কয়েকজন সাহিত্যিককে চিঠি লিখেছে, তাঁদের মধ্যে তিনজন উত্তর দিতেন নিয়মিত, তবু আপনিই ছিলেন ওর সবচেয়ে প্রিয় লেখক। ওর ডায়েরিতে চিঠির মতন কিছু কিছু লেখা ছিল, হয়তো তার মধ্যে কোনো কোনোটা আপনাকে উদ্দেশ্য করেই লেখা।

পুলকেশ আগ্রহের সঙ্গে বললেন, সেই ডায়েরিটা একবার দেখতে পারি?

দীপিকা বললো, সেসব তো এখানে নেই। ওর এক ভাই এসে ওর সব জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। দু'চারখানা বই-খাতা পড়ে আছে শুধু। ডায়েরিটা নিয়ে গেছে, আমি দেখেছি।

পুলকেশ জিজ্ঞেস করলেন, ওর বাড়িতে কে কে থাকে?

দীপিকা বললো, মীনাক্ষীর মা তো চলে গেছেন অনেকদিন আগেই। বাবার একমাত্র মেয়ে, আর দুই দাদা আর একটা ছোট ভাই আছে। টাকাপয়সার তেমন অভাব ছিল না, ও চাকরি করতো অনেকটা শখে।

জয়া বললো, শুধু শখে কেন? ও স্বাধীনভাবে থাকতে চেয়েছিল। ওর বাবা দু'তিন বার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন, ও রাজী হয়নি, সম্বন্ধ করা বিয়েতে ওর দারুণ আপত্তি ছিল। নিজে পছন্দ করলে....

পেছন থেকে একজন বললো, মেয়েটার এমনই দুর্ভাগ্য যে শেষ পর্যন্ত এমন একজন....

হঠাৎ থেমে গেল সে। কথাটার মধ্যে একটা ইঙ্গিত আছে, একটা গল্পের আভাস আছে। পুলকেশ ঘুরে দাঁড়ালেন। কিন্তু সে মেয়েটি আর কিছুই বললো না। অন্যরাও চুপ করে রইলো।

পুলকেশ আবার তাকালেন ছবিটির দিকে। মেয়েটির জীবন ও ব্যক্তিত্ব অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

আর কথা এগোতে পারলো না। আদিনাথ ধেয়ে এলো দলবল নিয়ে। প্রধান অতিথিকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে কারুকে কিছু না জানিয়ে, এটা খুব অন্যায়। মিনিস্টার পর্যন্ত ওঁকে খুঁজছিলেন। অন্য জায়গায় চায়ের আসরে গণ্যমান্য অতিথিরা অপেক্ষা করছেন, আদিনাথ প্রচণ্ড ধমকাতে লাগলো জয়া ও অন্য টিচারদের।

আদিনাথ বারবার বলতে লাগলো, আমার পারমিশান ছাড়া কেন নিয়ে এলেন এখানে? কেন নিয়ে এলেন?

আদিনাথ কি ভাবছে, এমন একটা জায়গায় আসাটা প্রধান অতিথির সম্মানের উপযুক্ত নয়? সে জানতে পারলে পুলকেশকে এখানে আসতে দিতই না মনে হয়!

পুলকেশ বললেন, আমি নিজেই ইচ্ছে করে এসেছি। জয়ার সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় ছিল।

শিক্ষিকাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসতে হলো অন্য এক চায়ের আসরে। অল্প দূরত্ব, তবু চড়তে হলো গাড়িতে।

চকবাজারে বেশ কয়েকটি চালের আড়ত ও সর্ষের তেলের কল আছে বলে, এখানকার কিছু লোক বেশ ধনাঢ্য। বুধবারে বড় হাট বসে। জায়গাটা ঠিক গ্রামও নয়, শহরও নয়।

রমেশ সিকদার এককালে ছোটখাটো জমিদার ছিলেন, এখন তাঁর ছেলে হাঁস-মুর্গির ব্যবসা করে। ভদ্রলোক বাতে পঙ্গু, হুইল চেয়ার ছাড়া চলাফেরাও করতে পারেন না। এই লোকটিই সত্যিকারের শিক্ষিত। ইংরিজি-বাংলা বহু বই পড়েছেন, কথাবার্তা শুনলেই

বোঝা যায়। এঁর প্রস্তাব অনুযায়ীই পুলকেশকে প্রধান অতিথি হিসেবে ডাকা হয়েছে।

চায়ের আসরে মাত্র সাত-আটজন নিমন্ত্রিত। বাইরের লোক এখানে ভিড় করে আসতে পারবে না। এ বাড়িতে একটা বড় কুকুর আছে।

রমেশ সিকদার বললেন, আপনাকে আমার বাড়িতেই রাখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কী, আমার বাড়িটা আপাতত মহিলা-বর্জিত। আমার স্ত্রী তো ভবধাম ছেড়ে গেছেন অনেক আগেই। দুই ছেলের বউই কলকাতায় থাকে, এখানে নাকি বাচ্চাদের পড়াশুনো হয় না। ঠাকুর-চাকরের হাতে সংসার। আপনি কি কালই ফিরবেন?

পুলকেশ মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ।

—আর দু'চার দিন থেকে যান না। এখানে কথা বলার লোক পাই না। তা ছাড়া, এখানে একটা সাঁওতাল গ্রাম আছে, ঘুরে দেখলে গল্পের উপাদান পেতে পারেন।

—উপায় নেই, অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে।

—এখানে আসার আগে বুঝি টিচারদের মেসে গিয়েছিলেন? শুনেছেন তো, একটি টিচার কিছুদিন আগে সুইসাইড করেছে? স্যাড, ভেরি স্যাড। খুব ব্রাইট মেয়ে ছিল। আমার এক নাতনীকে কিছুদিন পড়িয়েছিল বাড়িতে, পড়াশুনো করতো, বুঝলেন, আজকাল অনেক টিচারই তো পড়াশুনো করে না, এ মেয়েটি নিজের টাকায় বই কিনতো।

—নদীর ধারে গিয়ে রাত্তিরবেলা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে রইলো। এরকম সাধারণত শোনা যায় না।

—প্রায়ই নাকি রাত্তিরবেলা নদীর ধারে বসে থাকতো একলা একলা। সাপখোপের ভয় ছিল না। ভেরি ডেয়ারিং, বুঝলেন। ঠিক সাধারণ মেয়ে ছিল না।

—একসঙ্গে এত ঘুমের ট্যাবলেট পেল কোথায়?

—আজকাল কিছুই অসম্ভব নয়। পয়সা খরচ করলে সবই মেলে। এথিক্স বলে কিছু আছে নাকি?

অন্য নিমন্ত্রিতরা এতক্ষণ এই চকবাজার ও ইস্কুল সম্পর্কে অনেক কথা বলছিলেন, কিন্তু এই প্রসঙ্গে সবাই নীরব হয়ে রইলেন। যেন একটি তরুণীর মৃত্যুর মতন স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে কেউ কিছু বলতে চান না।

শুধু একজন খানিকটা ব্যাজার ভাবে ফস করে বলে উঠলেন, ওর তো চাকরি ছেড়ে চলে যাবার কথা ছিল। সেক্রেটারি নোটিস দেবে বলেছিল। যদি আগেই চলে যেত, তাহলে আমাদের চকবাজারের এরকম বদনাম হতো না।

এই কথাগুলো অন্য কারুরই পছন্দ হলো না। একসঙ্গে অনেকে প্রতিবাদ করে উঠলেন।

—না, না। সেক্রেটারি তো কোনো নোটিস দেয়নি।

—চকবাজারের বদনাম হবে কেন? সে আত্মহত্যা করেছে নিজের খেয়ালে।

—আগে তো আমরা ঘুণাক্ষরেও কিছু টের পাইনি। হাসি-খুশি ব্যবহার ছিল, পড়াতোও

ভালো।

দরজা দিয়ে আর একজনকে ঢুকতে দেখে চুপ করে গেল সবাই। ডাক্তার বিকাশ নন্দী।

সে বললো, কী, খুব দেরি করে ফেলেছি! চা শেষ? খাবার-টাবার চাই না, এক কাপ চা খুব দরকার।

ডাক্তারটির সঙ্গে এবারে ভালো করে আলাপ-পরিচয় হলো পুলকেশের। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করেছে, প্র্যাকটিস করে সিউড়ি শহরে। সেখানেই পৈতৃক বাড়ি। চকবাজারে আসে সপ্তাহে দু'দিন। এখানেও একটা বাড়ি ভাড়া নেওয়া আছে। সেই বাড়ির একটা অংশ নার্সিংহোমের মতন। চকবাজারের কাছাকাছি এলাকায় চিকিৎসার ভালো ব্যবস্থা নেই, বিকাশ নন্দীকে পেয়ে এখানকার লোক যেন ধন্য হয়ে গেছে, ডাক্তারের রোজগারও ভালো।

আজকের কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল, ডাক্তার এখানে বেশ জনপ্রিয়। রমেশ সিকদার অবস্থাপন্ন লোক হলেও তিনি কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসা করাতে চান না, চকবাজার ছেড়ে তিনি যাবেন না। বিকাশ নন্দী তাঁকে সপ্তাহে দু'দিন নিয়মিত দেখে, ওষুধ দিয়ে যায়।

বিকাশ নন্দী আফশোসের সুরে পুলকেশকে বললো, মুশকিল কি জানেন, ডাক্তারিতে একেবারে ছুটি পাওয়া যায় না। যত আপনি সাকসেসফুল হবেন, তত আপনার নিজের জীবন থেকে সব উপভোগ নষ্ট হয়ে যাবে। খুব ইচ্ছে ছিল, আজ সারা সন্ধ্যেটা আপনার সঙ্গে কাটাবো। উপায় নেই। একটা ডেলিভারি কেস আছে। এক্ষুণি আবার ছুটতে হবে। আপনার ডিনারের ব্যবস্থাও তো আদিনাথ করে ফেলেছে শুনলাম। আমি কিন্তু আপনার খুব ভক্ত।

ডাক্তার একটা হাত বাড়াতেই পুলকেশ খুব আন্তরিকভাবে সে হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলেন।

চায়ের আসর শেষ হলো পৌনে ন'টায়, তারপর ডিনারের জন্য অন্য বাড়িতে যাওয়া। সেখান থেকে সব শেষ করতে করতে প্রায় রাত বারোটা বেজে গেল।

নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে পুলকেশ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। সারা সন্ধ্যে অনেক বকবক করতে হয়েছে।

সব মিলিয়ে অবশ্য খারাপ লাগেনি।

এলাকার মানুষগুলির ব্যবহারে বেশ সরল আন্তরিকতা আছে। আধুনিক কালের সাহিত্য বিশেষ কেউ পড়েনি। হয়তো কলকাতার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের অভাবে তেমন সুযোগও পায় না। কিন্তু সাহিত্য সম্পর্কে একটা শ্রদ্ধার ভাব আছে অনেকের মনে। সাহিত্যিক অনেকটা কৌতূহলের বস্তু। অনেকেই বারবার পুলকেশকে জিজ্ঞেস করছিল, আপনারা লেখেন কী করে? সবই বানিয়ে বানিয়ে লেখেন?

সন্ধ্যেবেলা পুলকেশের একটু মদ্যপানের অভ্যেস আছে। এখানে কোনো আসরেই মদের ব্যবস্থা ছিল না। এদের মধ্যে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই মদ্যপায়ী, কিন্তু একজন সাহিত্যিককে ঐ জিনিসের ব্যাপারে বলতে সঙ্কোচ বোধ করেছে।

পুলকেশের সঙ্গে একটি ছোট বোতল থাকে সবসময়। পুলকেশ অ্যালকোহলিক নন, দু'-এক সন্ধ্যে বাদ গেলে কিছু আসে যায় না। কিন্তু এই নতুন জায়গায় ঘুম হবে কি? খানিকটা মদ্যপান করলে ঘুমের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

জামা-কাপড় বদলে পুলকেশ একটা গেলাশে কিছুটা মদ ঢেলে জল মেশালেন। এক চুমুক দেবার পর আরাম করে একটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি দেখতে লাগলেন উপহারের জিনিসগুলো। শালটা অতি সাধারণ, ডিজাইনেরও কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। তবে রুপোর থালাটা বেশ দেখতে। ওজন আছে।

ঊর্মিলা এই থালাটা দেখলে খুশি হবে। আরও কয়েক জায়গা থেকে পুলকেশ এরকম পেয়েছেন। সোনার মতন রুপোর ওপরেও মেয়েদের দুর্বলতা আছে। অথচ, এসব রুপোর থালা-বাটি কী কাজে লাগে? আজকাল কেউ রুপোর থালা-বাটিতে কিছু খায় নাকি? এগুলো আলমারিতে তোলা থাকে। সেখানেই থেকে যাবে!

ঊর্মিলা একদিন বলেছিল, বাঃ, এগুলোর দাম আছে না? বিপদে পড়লে বিক্রি করা যায়।

পুলকেশ হেসেছিলেন সে কথা শুনে। তিনি হঠাৎ মারা গেলে তাঁর স্ত্রী অভাবের তাড়নায় থালা-বাটি বিক্রি করতে যাবে? লেখক মারা গেলেও বেশ কিছু বছর তাঁর বইয়ের রয়্যালটি পাওয়া যাবে। ঊর্মিলা নিজেও চাকরি করে, তার চাকরিতে পেনশান আছে।

আজ বারবার মীনাক্ষী নামের মেয়েটির কথা মনে পড়ছিল। সে থাকলে আরও ভালো লাগতো। কেন সে আত্মহত্যা করলো? একটি তরুণী মেয়ে, বেশ ছটফটে স্বভাবের, অনেক ব্যাপারে তার উৎসাহ ছিল, কোন্ অভিমানে সে চলে গেল পৃথিবী ছেড়ে? কোনোদিনও জানা যাবে না।

একটা গ্রুপ ছবির মধ্যে মীনাক্ষীকে দেখেই ওর চেহারাটা পরিষ্কার মনে পড়ে গেছে পুলকেশের। মীনাক্ষীর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেনি পুলকেশ, অথচ সেই চকবাজারে তাঁকে আসতেই হলো। ঠিকানা লেখা কাগজটা যদি হঠাৎ কোনো বইয়ের ভাঁজ থেকে বেরিয়ে না পড়তো তা হলে চকবাজারে এসেও বোধহয় মীনাক্ষীর কথা তাঁর মনে পড়তো না।

সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। এখানকার লোকেরা তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। মনে হয় একতলায় আর কেউ থাকে না।

রমেশ সিকদারের বাড়িতে থাকলে এখনো নিরিবিলিতে থাকা যেত না। উনি একা থাকেন, নিশ্চয়ই গল্প করতে চাইতেন। লোকটির কথাবার্তার মধ্যে একটুও গ্রাম্যতা নেই,

অথচ উনি শহরে গিয়ে থাকতে চান না। শহরে ওর পঙ্গুতার ভালো চিকিৎসা হতে পারতো।

রমেশ সিকদারের চরিত্রে গল্পের উপাদান আছে। ওঁকে নিয়ে কিছু একটা লেখা যায়। ঠিক কী ধরনের গল্প, তা পুলকেশের কাছে এখনো স্পষ্ট নয়, কিন্তু অনেক মানুষের ভিড়ের মধ্যে এক একটি মানুষকে দেখলে এরকম মনে হয়। হয়তো এর পরের কোনো লেখার মধ্যে রমেশ সিকদারের ছায়া এসে যাবে।

দরজায় দু'বার ঠকঠক শব্দ হতেই পুলকেশ চমকে উঠলেন।

চারদিক এমনই নিস্তব্ধ যে শব্দটা অস্বাভাবিক মনে হয়। এই সময় কে আসবে?

একবার তিনি ভাবলেন, মদের গেলাশটা লুকোবেন কিনা।

পরের মুহূর্তেই তিনি আবার ভাবলেন, তিনি ছেলেমানুষ নাকি? নিজের ঘরে বসে একটু মদ্যপান করায় দোষের কী আছে?

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টেবিলটায় ধাক্কা লেগে গেলাশটা উল্টে পড়ে গেল। শেষ মুহূর্তে ধরে ফেলায় কাচের গেলাশটা ভাঙলো না বটে, কিন্তু পানীয়টা নষ্ট হলো।

পায়ে চটি গলিয়ে এসে তিনি দরজা খুললেন। কেউ নেই। টানা বারান্দাটা একেবারে শুনশান অন্ধকার।

পুলকেশ ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইলেন। কী ব্যাপার হলো? তিনি ভুল শুনেছেন? নাঃ, তা হতে পারে না। দরজাটা খুলতে একটু দেরি হয়েছে বলে কেউ চলে গেল?

তিনি অনুচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, কে? কে?

এবারে বারান্দার অন্য প্রান্তে যেন নড়ে উঠলো একটা স্তূপ। চাদর মুড়ি দিয়ে কেউ শুয়ে আছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো আস্তে আস্তে। তার পায়ে থপথপ শব্দ হচ্ছে।

কাছে আসার পর দেখা গেল, সে একটি মাঝবয়েসী লোক, মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি, হাতে একটা লাঠি। সে বললো, নমস্কার বাবু, আমার নাম হরিরাম, আপনার কিছু লাগবে?

পুলকেশ বললেন, না।

হরিরাম বললো, আমি এই নিচে শুয়ে থাকি। কিছু দরকার হলে আমায় ডাকবেন। সকাল না হলে একা একা বাগানে যাবেন না, কুকুর ছাড়া থাকে।

পুলকেশ আবার দরজা বন্ধ করে দিলেন। মনের মধ্যে একটা খটকা রয়ে গেল। ঐ হরিরামই দরজা ঠকঠক করেছিল কিনা সেটা তাকে জিজ্ঞেস করা হলো না। এইটুকু সময়ের মধ্যে লোকটা বারান্দার অত দূরে গিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো? অথচ সে আস্তে আস্তে থপথপ করে হাঁটে।

হরিরাম ছাড়া আর কেই বা হবে? আর কেউ নেই। এত রাতে কেউ তাঁর সঙ্গে কৌতুক করতেও আসবে না।

মাত্র দু'বার চুমুক দিয়েছিলেন, গেলাশটা প্রায় ভর্তিই ছিল। উল্টে পড়ে গেছে, তাই পুলকেশ হঠাৎ ঠিক করলেন, আজ আর মদ্যপান করবেন না। চোখ ভারি হয়ে আসছে, ঘুমের অসুবিধে হবে না, তা হলে আর দরকার কী!

আলো নিভিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন।

একটু পরেই তিনি দেখতে পেলেন, ডান দিকের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটি তরুণী। কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি পরা, মাথার চুল খোলা, নাকে জ্বলজ্বল করছে একটা নাকছাবি।

পুলকেশ জিজ্ঞেস করলেন, দরজা আমি নিজে বন্ধ করেছি, তুমি কী করে ভেতরে ঢুকে এলে?

মেয়েটি বললো, বলবো না!

পুলকেশ বললেন, ও, তখন যে দরজা খুললাম, হরিরামের সঙ্গে কথা বললাম, সেই ফাঁকে তুমি এসে লুকিয়েছিলে, তাই না?

মেয়েটি দু'দিকে মাথা নাড়লো।

অন্ধকারের মধ্যে যে শাড়ির রং বোঝা যায় না, চুল খোলা কি বাঁধা তা দেখা যায় না, সে সব কথা পুলকেশের মাথায় এলো না। সে সব তো তিনি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন। দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও সে কী করে ভেতরে এলো এই চিন্তাটাই যেন প্রধান।

পুলকেশ আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? ও বুঝেছি, বুঝেছি, বলতে হবে না, তুমিই তো মীনাক্ষী।

মীনাক্ষী বললো, আপনি আমার চিঠির উত্তর দেননি কেন?

পুলকেশ অপরাধী মুখ করে বললেন, খুব অন্যায় হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই তোমার চিঠিটা হারিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তুমি যে নিজের হাতে ঠিকানা লিখে দিয়েছিলে, সেটা কিন্তু আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি এতদিন। চিঠির উত্তর দিতে পারিনি বটে, তবে নিজে চলে এসেছি।

মীনাক্ষী বললো, এখানকার নদীটা দেখতে যাবেন না? চলুন, চলুন।

পুলকেশ বললেন, এখন? বাগানে কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এরকম সংলাপ বেশিক্ষণ চলে না। পুলকেশ ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

ঘর একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কেউ নেই, বলাই বাহুল্য।

পুলকেশ প্রথমে ভাবলেন, সত্যিই মীনাক্ষী এসেছিল? আবার লুকিয়েছে কোথাও?

পুলকেশ দুর্বল ধরনের মানুষ নন। ভূত-টুতে ভয় পান না, আত্মার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করেন না। সারাদিন বারবার মীনাক্ষীর নাম উচ্চারিত হয়েছে, পুলকেশ ওর কথা ভেবেছেন, তাই ওকে স্বপ্নে দেখা অস্বাভাবিক কিছু নয়। একেবারে বাস্তবের মতন স্বপ্ন।

আবার শুয়ে পড়লেন পুলকেশ। চোখ বুঁজতে না বুঁজতেই আবার স্বপ্নটা ফিরে এলো। এবার আর ঘরের মধ্যে নয়, নদীর ধার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মীনাক্ষী, তার পাশে একজন

পুরুষ। পুলকেশ ভাবলেন, ঐ লোকটি কে, আমি নাকি? না, না, আমি আবার মীনাক্ষীর সঙ্গে হাঁটলাম কবে? লোকটির মুখ দেখা যাচ্ছে না, বয়েসও পুলকেশের চেয়ে কিছুটা কম মনে হয়, বাঁ দিকের ঘাড়ের কাছে একটা আঁচিল, সে একটি হাত রাখলো মীনাক্ষীর কাঁধে।

পুলকেশ মনে মনে বললেন, এটা আমি স্বপ্ন দেখছি।

পরের মুহূর্তেই কথাটা ভুলে গিয়ে আবার একটা দৃশ্য দেখলেন।

খুব বৃষ্টি হচ্ছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আকাশে, বেশ রাত, তারই মধ্যে টিচারদের মেস থেকে একা রাস্তায় বেরিয়ে এলো মীনাক্ষী। মেয়েটার ভয়-ডর নেই, খুব রোমান্টিক স্বভাবের তো। বৃষ্টিতে ওর সারা শরীর ভিজিয়ে দিচ্ছে, তবু ভ্রূক্ষেপ নেই—একসময় সে ছুটতে শুরু করলো। পুলকেশ হাসলেন, এইরকম নিয়ম-না-মানা মেয়েদের তাঁর ভালো লাগে।

নদীর ধারে বসে আছে মীনাক্ষী। ঘন ঘন তাকাচ্ছে একদিকে, যেন কারুর প্রতীক্ষা করছে। কেউ আসছে না। গুনগুন করে গান গাইছে। না, না, গান তো নয়, কাঁদছে আপনমনে। অনেক সময় কান্না আর গান একই রকম মনে হয়।

পুলকেশ চোখ মেলে তাকালেন। স্বপ্ন ভেঙে গেল। আবার চোখ বুঁজলেন, আবার সেই স্বপ্ন। এক এক রাতে এরকম হয়, একই স্বপ্ন ধারাবাহিকভাবে চলে, বারবার একই দৃশ্য ফিরে আসে, কোনো মাথামুণ্ডু নেই।

একজন পুরুষের পাশাপাশি হাঁটছে মীনাক্ষী। মনে হয় প্রেমিক-প্রেমিকা। লোকটির মুখ দেখা যাচ্ছে না, হাঁটার ভঙ্গিটা চেনা চেনা, আদিনাথ গায়েন নাকি? স্কুলের সেক্রেটারির সঙ্গে কোনো শিক্ষয়িত্রীর ঘনিষ্ঠতা তো হতেই পারে।

জয়া শুয়ে আছে একটা খাটে, আর একটা খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে একটা মোটা খাতায় কী যেন লিখছে মীনাক্ষী। গভীর মনোযোগ দিয়ে লিখতে লিখতে একবার মুখ ফিরিয়ে বললো, আপনি দেখবেন? আমার ডায়েরিটা আপনাকে খুব দেখাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আপনার সময় কোথায়?

কে যেন পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে মীনাক্ষীকে। তার ঠোঁটের দু'পাশে ফেনা। চোখ বোজা। পাশে পাশে চলেছে একজন, তার হাতে টর্চ।

আবার উঠে বসলেন পুলকেশ। স্বপ্নের ঘোরটা কাটাবার চেষ্টা করলেন। এইভাবে একজনকে নিয়ে অর্থহীন স্বপ্ন দেখতে থাকলে ঘুম আসবে কী করে? মীনাক্ষী বসুচৌধুরী মরে গেছে, হারিয়ে গেছে, তাকে নিয়ে শুধু শুধু স্বপ্ন দেখে কী হবে?

পুলকেশ বসেই রইলেন। পুরোপুরি জেগে না উঠলে ঐ স্বপ্নটা তাড়ানো যাবে না। কাল বেলা এগারোটায় ট্রেন, ভোরে উঠে ট্রেন ধরার হুড়োহুড়ি নেই, এখন নিশ্চিন্তভাবে ঘুমোনো দরকার।

প্রায় আধঘণ্টা পর পুলকেশ ভাবলেন, আমি শুধু শুধু বসেই বা আছি কেন? না শুলে কি ঘুম হয়! পেটটা একটু একটু ব্যথা করছে যেন। এটাও কি স্বপ্ন নাকি?

একটু জল খেয়ে দেখা যাক।

জলের বোতলটা নিয়ে একটা চুমুক দিতেই পুলকেশ দারুণ ছটফটিয়ে উঠলেন। বোতলটা হাত থেকে খসে পড়লো বিছানার ওপর। পেটের মধ্যে সাংঘাতিক কোনো কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। আগুনে পোড়া মানুষের মতন বিছানায় গড়াগড়ি দিতে লাগলেন তিনি।

ব্যথাটা হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে, শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেছে। বিছানা থেকে নামার চেষ্টা করেও দাঁড়াতে পারলেন না পুলকেশ, দড়াম করে পড়ে গেলেন মেঝের ওপর। চোখ দুটো যেন কেউ জোর করে বুঁজিয়ে দিচ্ছে।

শুধু পেটব্যথা নয়, ধকধক করছে বুক। পুলকেশ বুঝতে পারলেন, তিনি মরে যাচ্ছেন। রাত্তিরের খাবারে কোনো গণ্ডগোল ছিল? ফুড পয়জন? অথবা হার্ট অ্যাটাকে এরকম হয়? আর দেরি নেই, এই ঘরের মধ্যে তিনি মরে পড়ে থাকবেন, উর্মিলার সঙ্গে আর দেখা হবে না, মেয়েটা আছে দিল্লিতে, সেও আর তার বাবাকে দেখবে না....।

গোঙাতে গোঙাতে মাটিতে প্রাণপণে হামাগুড়ি দিতে লাগলেন পুলকেশ। অন্ধের মতন এগোতে লাগলেন দরজার দিকে। দরজায় তিনি নিজের হাতে ছিটকিনি দিয়েছেন। বারান্দায় যে লোকটা শোয়, কী যেন তার নাম? কেউ জানতে পারবে না, কোনো চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যাবে না, এখানেই তাঁর শেষ নিশ্বাস পড়বে?

পুলকেশ শেষ শক্তি দিয়ে দেওয়াল ধরে উঠে দাঁড়ালেন। দরজার ছিটকিনিটা কেনোক্রমে খুলে তিনি বিকৃত গলায় ডাকলেন, হরিরাম! হরিরাম, বাঁচাও!

তারপর আছড়ে পড়লেন বারান্দায়।

।। ৪ ।।

কী যেন একটা পাখি ডাকছে।

বেশ মিষ্টি স্বর, খুব কাছেই মনে হয় বসে আছে পাখিটা। পাখি যখন ডাকছে, তখন নিশ্চয়ই রাত কেটে গেছে।

পুলকেশের চক্ষু বোঁজা, কোথায় শুয়ে আছেন, কেন শুয়ে আছেন সে কথা মনে পড়ছে না। তিনি পাখিটার কথা ভাবতে লাগলেন। ছোটবেলা, দশ-এগারো বছর বয়েসে, পুলকেশ তখন থাকতেন রাজারহাট-বিষ্ণুপুরে মামার বাড়িতে, একজন মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে টো-টো করে ঘুরতেন দুপুরে রোদ্দুরে। একবার নদীর ধারে বেতগাছের ঝোপে একটা বুলবুলি পাখির বাসা দেখতে পেয়েছিলেন, একটা মা-বুলবুলি ডিমের ওপর তা দিচ্ছিল। দুটি বালককে কাছাকাছি দেখেও পাখিটা উড়ে যায়নি, পুলকেশের ডান হাত খপ করে পাখিটাকে ধরে ফেলেছিল।

বুলবুলিটাকে অবশ্য ওরা বন্দী করে রাখেনি। বেশিক্ষণ ধরেও রাখা যায়নি, বিকেলের দিকে উড়ে গিয়েছিল। পরদিন আবার ওরা নদীর ধারে সেই বেতগাছের ঝোপে উঁকি

মেরে দেখেছিল, সেই বাসাটা পরিত্যক্ত। পাখিটা তো নেই বটেই, ডিম দুটোও নেই। বুলবুলিটা অন্য জায়গায় বাসা বানিয়েছে, মানুষ যেমন এক পাড়ায় গণ্ডগোল হলে অন্য পাড়ায় উঠে যায়, কিন্তু ডিম দুটো কোথায় গেল? পাখি কি ডিম মুখে করে নিয়ে যেতে পারে? কিংবা একবেলার মধ্যেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে গেল?

পরবর্তীকালে যতবার সেই ঘটনাটা মনে পড়েছে, অনুতাপ বোধ করেছেন পুলকেশ। নিছক ছেলেমানুষী নিষ্ঠুরতায় তিনি একটি পাখিকে বাসা-ছাড়া করেছিলেন। এর পর যখনই কোনো বুলবুলি পাখির ডাক শুনতে পান, পুলকেশের একটু ভয় ভয় করে, মনে হয় পাখিটা তাঁকে ধমকাচ্ছে। দুনিয়ার সব বুলবুলি যেন তাঁর সেই অপরাধের কথা জেনে গেছে।

এই পাখিটাও কি বুলবুলি?

পুলকেশ চোখ মেলে দেখলেন, সামনের দেওয়ালে একটা শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি। তার পাশেই একটা জানলা। সেই জানলা দিয়ে একটা বাগান দেখা যাচ্ছে।

অন্য পাশ ফিরে দেখলেন, ছোট্ট একটি ঘর, লোহার খাটে শুয়ে আছেন তিনি, হাসপাতালের বেডের মতন। এক পাশের চেয়ারে একটি মহিলা বসে মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছে।

পুলকেশের নড়াচড়ার শব্দ শুনে মহিলাটি বই থেকে চোখ তুললো। তিরিশের কাছাকাছি বয়েস, মাথার চুল কোঁকড়া, বেশ ফর্সা ফুটফুটে মুখখানি, কপালে একটা সবুজ টিপ।

পুলকেশের এখনো ঘোর কাটেনি, আচ্ছন্ন গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ওটা কী পাখি ডাকছে?

মেয়েটি পুলকেশের কথা বুঝতে না পেরে কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, কী বললেন? কিছু বললেন?

পুলকেশ আবার জিজ্ঞেস করলেন, কী পাখি?

ততক্ষণে পাখিটার ডাক থেমে গেছে। জ্ঞান ফেরার পরই একজন পাখির ডাকের কথা জিজ্ঞেস করবে, এটা এতই অপ্রত্যাশিত যে মেয়েটি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো, মনে হচ্ছে দোয়েল।

পুলকেশ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, ও!

তারপর আবার বললেন, তুমি...আপনি কে?

মেয়েটি বললো, আমি সুপ্রিয়া...আপনি খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।

পুলকেশ এই মেয়েটিকে জীবনে দেখেননি। অথচ সে বেশ অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলছে। এখনো তিনি বুঝতে পারছেন না, কোথায় শুয়ে আছেন। মনে পড়ছে না আগের রাতের কথা। এটা কি হাসপাতাল? তাহলে এই মেয়েটি কে? একটা বুটি দেওয়া লাল শাড়ি পরা, নার্স হতে পারে না, নার্সরা লাল শাড়ি পরে নাকি?

পুলকেশ জিজ্ঞেস করলেন, কে ভয় পেয়েছিল?

সুপ্রিয়া বললো, আমরা সবাই। তখন প্রায় রাত তিনটে, হরিরাম ছুটতে ছুটতে এলো—

পুলকেশ ধড়মড় করে উঠে বসলেন। হঠাৎ তাঁর সব মনে পড়ে গেল। আমি মরে যাচ্ছিলাম, আমি মরে যাচ্ছিলাম!

সুপ্রিয়া তাড়াতাড়ি পুলকেশের বাহু চেপে ধরে বললো, উঠবেন না, উঠবেন না। হঠাৎ উঠলে মাথা ঘুরে যাবে।

—আমার কী হয়েছিল?

—আপনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, ঠিক কী যে হয়েছিল...আপনি এত কষ্ট পাচ্ছিলেন, ছটফট করছিলেন, তাই আপনাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসা হলো।

—এটা...আপনাদের বাড়ি? হাসপাতাল নয়?

—এখানে তো হাসপাতাল নেই, হেল্‌থ সেন্টারও নেই। আমার স্বামী ডাক্তার, এ বাড়িরই খানিকটা অংশ নার্সিংহোমের মতন করা আছে।

—ডাক্তার? কে ডাক্তার?

—ওঁর নাম বিকাশ নন্দী, আপনার সঙ্গে তো পরিচয় হয়েছে।

—হ্যাঁ। হ্যাঁ, বিকাশ নন্দী। আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম? কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলাম?

—ঠিক অজ্ঞান নন, আপনি অত কষ্ট পাচ্ছিলেন বলে আপনাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল, এখন কেমন আছেন?

—মাথাটা দুর্বল লাগছে। আমার হঠাৎ এমন হলো কেন? আগে কক্ষণো আমার জীবনে এরকম কিছু ঘটেনি।

—আমার স্বামী একটু বাদেই এসে পড়বেন, উনি আপনাকে সব বুঝিয়ে বলবেন। এখানে একটি মেয়েকে নার্সিং-এর ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, সে দেখাশুনো করে, সেই নমিতা আবার ক'দিন ধরে আসছে না, ছোট বোনের বিয়েতে গেছে, অবশ্য আর কোনো পেশেন্ট ভর্তি নেই, খুব এমার্জিন্সি না হলে এখানে কারুকে আনা হয় না।

—তাই আপনাকেই নার্সের ডিউটি দিতে হচ্ছিল?

—আমি বসেছিলাম, আপনি হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠলে কিছুই বুঝতে পারবেন না, অচেনা জায়গা।

হঠাৎ হেসে ফেললো সুপ্রিয়া। পুলকেশ সেই হাসির মর্ম বুঝতে পারলেন না। কিন্তু এই মেয়েটির কথাবার্তার মধ্যে বেশ একটা আন্তরিকতার সুর আছে। সহজেই সে অন্যদের আপন করে নিতে পারে।

সুপ্রিয়া আবার বললো, আপনি জেগে উঠে সেই কী একটা পাখির কথা বললেন?

পুলকেশ খানিকটা অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, পাখি? তাই বলেছি নাকি?

—বুঝতে পারছি, তখনো আপনার ওষুধের ঘোর কাটেনি। তখন ভাবলাম, লেখক-

মানুষরা বুঝি এই রকমই কথা বলে!

—বুলবুলি নয়, দোয়েল!

—আপনার এখন ব্যথা-ট্যথা করছে না তো? একটা মজার কথা বলবো?

—বলুন!

—এই দেখুন বইটা, আপনারই লেখা। একজন লেখকের বই পড়ছি, সেই লেখক আমার সামনেই শুয়ে আছেন, আমি একবার করে আপনার মুখের দিকে তাকাচ্ছি, আবার আপনার লেখার মধ্যে ডুবে যাচ্ছি, এরকম অভিজ্ঞতা ক'জনের হয়?

—আপনাদের খুব জ্বালাতন করেছি বলুন! হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া, আপনাকে আমার সেবা করতে হয়েছে, আবার আমার লেখা বইও পড়তে হয়েছে, এ তো রীতিমতন উপদ্রব!

—বইটা কিন্তু ভালো। আপনার লেখা আমি দু'তিনটে মাত্র পড়েছি, সবচেয়ে ভালো লাগছে এইটা।

পুলকেশ গোপনে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললেন। বই যতই বিক্রি হোক বা না হোক, সরাসরি কোনো পাঠক বা পাঠিকার মুখ থেকে এরকম কিছু শুনতে পেলে বিশেষ আনন্দ হয়! অনেকে বলে, আপনার লেখা পড়েছি। তারপর থেমে যায়, ভালো লেগেছে না মন্দ লেগেছে, সেই মতামতটা দেয় না, তাতে লেখকদের কী যে অস্বস্তি হয়, তা ওরা বোঝে না।

সুপ্রিয়া বললো, আপনার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। আমি শুধু বকবক করে যাচ্ছি। কী খাবেন বলুন তো! সলিড ফুড কিছু এখন না খাওয়াই ভালো। সরবৎ করে এনে দেবো?

পুলকেশ বললেন, না, শুধু এক কাপ চা পেলে ভালো হয়।

সুপ্রিয়া বললো, চা, হ্যাঁ, সকালে উঠে চা খেতে তো ইচ্ছে হবেই, কিন্তু গরম কিছু দিতে ও বারণ করে গেছে। সরবৎই খান বরং।

পুলকেশ খানিকটা ছেলেমানুষের মতন জেদ করে বললেন, না, সরবৎ চাই না। আমি চা-ই খেতে চাই।

—গরম চা খেলে যদি আবার ব্যথা হয়?

—আমার কি ফুড পয়জনিং হয়েছিল?

—আদিনাথের বাড়িতে আরও যে সাত-আটজন কাল রাত্তিরে নেমন্তন্ন খেয়েছে, তাদের কারুরই কিন্তু কিছু হয়নি। এখানে চিংড়িমাছ সহজে পাওয়া যায় না। আদিনাথ যোগাড় করেছিল অনেক কষ্টে, আপনার কি চিংড়িমাছে অ্যালার্জি আছে?

—কোনোদিন না। চিংড়ি খেতে আমি ভালোবাসি। কোনো খাবারেই আমার অ্যালার্জি নেই।

—তা হলে কী জন্য যে ব্যথাটা হলো...ঠিক আছে, আপনাকে চা দিতে বলছি।

দরজা ঠেলে ঢুকে এলো একটি ফুটফুটে ছেলে। ছ'সাত বছর বয়েস। ছেলেটি রীতিমতন

চোখে পড়ার মতন সুন্দর। মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল, টানা টানা চোখ, গায়ের রং দুধে-আলতায় মেশানো, ঠিক যেন দেবদূত।

সে প্রথমে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো পুলকেশের দিকে। তারপর সুপ্রিয়ার কাছ ঘেঁষে এসে বললো, আমার সঙ্গে দাবা খেলবে চলো।

সুপ্রিয়া বললো, এই আমার ছেলে, সুপ্রকাশ। ডাকনাম বিল্টু। আমরা তো এখানে থাকি না, বিল্টুর এখানে বন্ধু নেই। আমাকেই ওর সঙ্গে দাবা খেলতে হয়। ওর খুব দাবা খেলায় ঝোঁক, ভবিষ্যতে গ্র্যান্ড-মাস্টার হবে।

পুলকেশ মুগ্ধভাবে বললেন, ভারি সুন্দর ছেলে।

বিল্টু পুলকেশকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি দাবা খেলতে জানো?

পুলকেশ দু'দিকে মাথা নাড়লেন। তারপর সুপ্রিয়াকে বললেন, আপনি যান না, ওর সঙ্গে খেলুন গিয়ে। আমি তো এখন ভালোই আছি।

সুপ্রিয়া উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আপনি কিন্তু টপ করে বিছানা থেকে নামবেন না। কাল যা অবস্থা হয়েছিল, হঠাৎ আবার মাথা ঘুরে যেতে পারে। বাথরুমে যেতে হলে...ছোটুলাল এসে আপনাকে সাহায্য করবে।

একটু পরে চা নিয়ে এলো একজন কাজের লোক। মাঝবয়েসী, বেশ তাগড়া চেহারা, চোখ দুটি লালচে। তার দিকে চোখ পড়ামাত্র পুলকেশের মনে হলো, একে যেন আগে কোথায় দেখেছেন।

লোকটির নিশ্বাসে নির্ভুল মদের গন্ধ। এই সকালবেলাতেই মদ্যপান করেছে? নাকি, কাল অনেক রাত পর্যন্ত চালিয়েছে?

চা দিয়েও সে দাঁড়িয়ে আছে। হোটেলের বেয়ারারা এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। বখশিস চায় নাকি?

পুলকেশ পাজামা-পাঞ্জাবি পরে আছেন। এই পোশাকে কাল শুয়েছিলেন। পকেট ফাঁকা। মানিব্যাগ, তাঁর সব কিছুই ভুবন সরকারের বাড়িতে পড়ে আছে।

তিনি চায়ে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমারই নাম ছোটুলাল?

সে বললো, জী হাঁ। আমি ডাক্তার সাহেবের কাছে বারো বরষ নোকরি করছি। ডাক্তার সাহেব আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। উনি কৃপা না করলে এতদিনে আমি ফৌত হয়ে যেতাম।

আর কিছু জিজ্ঞেস না করলেও সে তার জীবন-কাহিনী বলে যায়। তার বাড়ি ছাপড়া জেলায়। ছোটবেলাতেই বাপ মারা যায়, মামার বাড়িতে কিছুদিন ছিল, এক মামা যখন তখন পেটে চিমটি কাটতো, আর মামী তাকে পোড়া রুটি খেতে দিত, তাই সে বাড়ি ছেড়ে পালায় একসময়। ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে রমেশ সিকদারের বাড়ি নোকরি পেয়েছিল। সেখানে ভালোই ছিল, কিন্তু একদিন সন্ধ্যেবেলা তাকে সাপে কামড়ালো, মস্ত বড় সাপ। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে একসময় সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, সবাই ধরে

নিয়েছিল সে মরেই গেছে। ভোরবেলা এই ডাক্তারবাবু তাকে দেখে সুঁই দিয়ে বাঁচিয়ে তোলেন। সেই থেকে সে ডাক্তারবাবুর কেনা হয়ে আছে। এই বাড়িতে থাকে, মাইনে-কড়ি কিছু নেয় না। বউদিদি যখন থাকেন না, তখন সে ডাক্তারবাবুর জন্য রান্না করে দেয়, সবরকম খিদমৎ করে, ডাক্তারবাবুর জন্য সে জান দিয়ে দিতে পারে।

গল্পের মাঝখানে বাধা দিয়ে পুলকেশ জিজ্ঞেস করলেন, বাথরুমটা কোথায়?

খাট থেকে নেমে দাঁড়াতেই মাথাটা একবার ঝিমঝিম করে উঠলো। দেওয়াল ধরে একটু দাঁড়িয়ে খানিকটা সামলে নিলেন পুলকেশ। তারপর মনের জোর এনে হেঁটে গেলেন।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখলেন, ছোটুলাল তাঁর বিছানাটা বদলাচ্ছে আর মাথা নেড়ে নেড়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে আপনমনে। ঘরে দুটি খাট। জানলার ধারের খাটটিতে শুয়ে ছিলেন পুলকেশ, অন্য খাটটি ছিল খালি, বিছানা পাতাও ছিল না, শুধু একটা লোহার খাট। সেই খাটে এখন পাতা হচ্ছে বিছানা।

পুলকেশ জিজ্ঞেস করলেন, জানলার ধার থেকে আমাকে সরালে কেন? ওখানেই তো বেশ ছিল!

ছোটুলাল মুখ তুলে কী যেন বলতে গেল। দু'এক পলক তাকিয়ে থেকে ও কিছু বললো না। বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

পুলকেশ ভাবলেন, যাক গে। তিনি তো আর আজ এখানে রাত কাটাবেন না। খানিক বাদে ট্রেন ধরতে হবে।

একটু পরেই দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো ডাক্তার বিকাশ নন্দী। সাদা প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরা, তাকে দেখাচ্ছে ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মতন।

কিন্তু তার মুখখানি দারুণ চিন্তাক্লিষ্ট, কপালটা ঘামে ভেজা। ফ্যাকাশেভাবে হেসে সে বললো, আপনি ভালো আছেন? আমার স্ত্রীর কাছে শুনলাম আর কোনো অসুবিধে হয়নি—

পুলকেশ বললেন, না। এখন তো ভালোই আছি। আমার কী হয়েছিল?

বিকাশ বললো, সেটাই তো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আপনাকে ও বাড়ি থেকে নিয়ে আসার সময় এমন গ্যাসপ করছিলেন, আমি ভয় পাচ্ছিলাম, আমার কাছে অক্সিজেন সিলিন্ডার নেই....।

পুলকেশ একটা বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হার্ট অ্যাটাক?

—সেটাই প্রথমে মনে হয়। ফরচুনেটলি আমার কাছে ই সি জি মেশিন আছে, নাঃ, আপনার হার্টে কোনো গোলমাল নেই।

—ব্যথাটা আমার পেটে হচ্ছিল। বুকে নয়।

—সেটা অনেক সময় বোঝা যায় না।

—তবে কি অ্যাপেনডিক্স-এর ব্যথা? অনেক সময় বার্স্ট করে শুনেছি।

—অ্যাপেনডিক্স হতে পারে। বার্স্ট করেনি, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। আলসার হতে পারে। কিডনিতে স্টোন হতে পারে।

—কিডনিতে স্টোন হলেও খুব ব্যথা হয়। কিন্তু তা কি এত সহজে কমে যায়?

—অনেক সময় পেচ্ছাপের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। সোনোগ্রাফি করলে বোঝা যাবে।

—এখন কটা বাজে? আমার ট্রেনের আর কত দেরি?

—আপনি কি আজই ফিরে যাবার কথা ভাবছেন নাকি?

—বাঃ, ফিরবো না? কলকাতায় গিয়ে সব টেস্ট করাবো।

—পুলকেশবাবু, আমি কিন্তু ডাক্তার হিসেবে আপনাকে আজ ছেড়ে দিতে রাজী নই। ট্রেনে যদি হঠাৎ আবার ওরকম ব্যথা শুরু হয়? অন্তত দুটো দিন অবজারভেশানে থাকা উচিত। আমি সিউড়ি থেকে ওষুধ আনাচ্ছি। অত ব্যথা হয়েছিল, হঠাৎ কমে গেল, এটা একটা মিরাকল্ বলা যেতে পারে।

—আরও দু'দিন থাকতে হবে?

এক প্লেটভর্তি পাকা পেঁপে নিয়ে এসে সুপ্রিয়া দাঁড়িয়েছে ডাক্তারের পেছনে। সে বলে উঠলো, না, না, আজ আপনাকে কিছুতেই যেতে দেওয়া হবে না। আপনার কোনো অসুবিধে হবে না এখানে।

পুলকেশ দুর্বলভাবে বললেন, অসুবিধের জন্য নয়। কলকাতায় অনেক কাজ পড়ে আছে।

সুপ্রিয়া বললো, শরীর আগে, না কাজ আগে? শরীর অসুস্থ হয়ে পড়লে কোনো কাজেরই মূল্য নেই।

বিকাশ বললো, পেটে যখন একদম ব্যথা নেই, তখন ভাত খেতে পারেন। পাতলা করে ঝোল ভাত খেয়ে দুপুরে আর একটা ঘুম দিন। ঘুমটা আপনার দরকার।

পুলকেশ বললেন, আমার জ্বরটর কিছু নেই। পেটেও ব্যথার কোনো চিহ্ন নেই। এখন মনে হচ্ছে, কাল আমার কিছুই হয়নি। দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম।

বিকাশ বললো, দুঃস্বপ্নে কেউ অমনভাবে ছটফট করে? অতক্ষণ ধরে? না, না, এমন হালকাভাবে উড়িয়ে দেবেন না।

সুপ্রিয়া বললো, আমরা বুধবার সিউড়ি ফিরছি। আপনি মঙ্গলবার পর্যন্ত এখানে থাকুন। আপনাকে কাছে পেয়েছি, আমরাই বা ছাড়বো কেন?

বিকাশকে আবার বেরুতে হলো।

সুপ্রিয়া একটুক্ষণ গল্প করে চলে গেল ভেতরে।

পুলকেশ শুয়ে পড়লেন। মাথাটা সামান্য টনটন করছে, এ ছাড়া শরীরে আর কোনো অস্বস্তি নেই। ঘুমের ওষুধটা বোধহয় এখনো কাজ করছে, সেই জন্য মাঝে মাঝে চোখ টেনে আসছে।

শুধু শুধু শুয়ে থাকতে পারেন না পুলকেশ। একটা না একটা বই পড়া অভ্যেস। এ

ঘরে বই বা পত্র-পত্রিকা কিচ্ছু নেই। জানলা দিয়ে দেখা গেল, বাগানে মাটি খুঁড়ছে ছোটুলাল, মাঝে মাঝে এ ঘরের দিকে তাকাচ্ছে। একবার চোখাচোখি হলো।

সে যেন কিছু বলতে চায়। তার জীবনকাহিনী আরও বাকি আছে?

দাবার বোর্ড বগলে নিয়ে ঘরে ঢুকে এলো বিল্টু। পুলকেশকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

ছেলেটি এমনই সুন্দর যে ওকে দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পুলকেশ বাচ্চাদের সঙ্গে ঠিক মিশতে পারেন না। দূর থেকে দেখাই ভালো।

বিল্টু জিজ্ঞেস করলো, এই, তুমি দাবা খেলতে পারো?

পুলকেশ দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, না তো ভাই। জানি না।

বিল্টু আবার জিজ্ঞেস করলো, তুমি কী খেলা জানো?

পুলকেশ বললেন, তাই তো, কী খেলা, কী খেলা, নাঃ, আমি কোনো খেলাই জানি না।

ভেতর থেকে সুপ্রিয়া ডাকলো, বিল্টু, বিল্টু—

বিল্টু ভেতরে চলে যাবার কয়েক মিনিট পরেই পুলকেশ দেখতে পেলেন, তার পাশের খাটটিতে একটি তরুণী মেয়ে শুয়ে আছে। তাঁর দিকেই পাশ ফেরা। মুখখানা যেন নীল হয়ে আছে, চোখ দুটি খোলা কিন্তু নিঃস্পন্দ।

পুলকেশ অস্ফুটভাবে বললেন, মীনাক্ষী?

হ্যাঁ, সেই মেয়েটি মীনাক্ষীই। সে কাতরভাবে বললো, আমি মরতে চাই না। আমার খুব বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

পুলকেশ বললেন, না, না, তুমি মরবে কেন? তোমার এত কম বয়েস!

মীনাক্ষী বললো, আপনি ওকে বলুন না।

পুলকেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কাকে বলবো?

মীনাক্ষী বললো, ভালোবাসা কি পাপ? আমি তো ওর কাছে আর কিচ্ছু চাইনি। আমি কারুর কোনো ক্ষতি করিনি। হঠাৎ ও একদিন বললো, আমার জন্য ওর খুব অসুবিধে হচ্ছে। আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। অথচ টানা তিন বছর ও আমার সঙ্গে...আমরা দু'জনে নদীর ধারে...আপনি এখান থেকে যেতে পারবেন না, আপনাকে সব জানতে হবে...আপনি ওকে চিনে রাখুন।

পুলকেশ বললেন, ও মানে কে? তুমি কার কথা বলছো?

মীনাক্ষী বললো, আমার খুব বাঁচতে ইচ্ছে করে। অন্যরা সবাই থাকবে, কেন শুধু আমায় চলে যেতে হবে?

পুলকেশ হাত বাড়িয়ে মীনাক্ষীকে ছুঁয়ে সান্ত্বনা দিতে গেলেন। হাতটা লাগলো ফাঁকা খাটে।

এর মধ্যে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন? স্বপ্নে দেখলেন মীনাক্ষীকে? অথচ এত বাস্তব

মনে হচ্ছিল, ঠিক যেন সে পাশের খাটে শুয়ে আছে।

এই স্বপ্নের মানে কী? মীনাক্ষী বারবার বলছিল, আমি বাঁচতে চাই। তাহলে কি ও আত্মহত্যা করেনি?

মীনাক্ষী বারবার দেখা দিচ্ছে স্বপ্নে। স্বপ্ন তো মানুষের নিজেরই মনগড়া হয়। কোনো মৃত আত্মা কি স্বপ্নে দেখা দিতে পারে? ধ্যাৎ, যত সব বাজে কথা!

।। ৫ ।।

একটু বেলায় দেখা করতে এলো জয়া আর নীতিসুধা। ওরা একটা ফুলের তোড়া এনেছে।

জয়া বললো, আমরা স্টেশনে যাবো ঠিক করেছিলাম। বেরুতে যাচ্ছি, তখন শুনলাম, আপনি অসুস্থ। আপনার কী হয়েছিল?

পুলকেশ মৃদু হেসে বললেন, এমন কিছুই না। এমনি তোমাদের এখানে আরও দু'একদিন থেকে যাবার ইচ্ছে হলো।

নীতি বললো, না, আপনার খুবই শরীর খারাপ হয়েছিল। মাঝরাত্তিরে ও বাড়ি থেকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।

পুলকেশ বললেন, হ্যাঁ, পেটে ব্যথা হয়েছিল। এখন একেবারে ঠিক হয়ে গেছে।

—তা হলে আপনি এখানে থাকবেন? এই রুগীর খাটে শুয়ে থাকবেন?

—তাতে কোনো অসুবিধে নেই। ডাক্তারের স্ত্রী আমার খুব যত্ন করছে। সুপ্রিয়া মেয়েটি বেশ ভালো।

—আপনি আমাদের ওখানে চলুন। আমরাও আপনার খুব যত্ন করবো।

—তোমাদের ওখানে? মেয়েদের হস্টেলে কোনো পুরুষ মানুষ থাকে নাকি?

—আমাদেরটা তো মেয়েদের হস্টেল নয়। আমাদের মেস। আমাদের কারুর বাবা কিংবা দাদা এলে থাকে। চলুন, চলুন, মীনাক্ষীর খাটটা খালিই পড়ে আছে।

—মীনাক্ষী যখন ডেকেছিল, তখন আসিনি। এখন তার খাটে গিয়ে শোবো?

—তবু তো আপনি এসেছেন। আপনি ঐ খাটে শুলে মীনাক্ষীর আত্মা নিশ্চয়ই তৃপ্তি পাবে।

—তোমরা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করো?

জয়া বললো, বাঃ, আত্মা থাকে না মানুষের? আমার তো মনে হয়, মীনাক্ষীর অতৃপ্ত আত্মা কাছাকাছিই ঘুরছে, আমাদের ওপর লক্ষ্য রাখছে।

নীতি বললো, আত্মা অনেক সময় প্রতিশোধ নেয়।

পুলকেশ জিজ্ঞেস করলেন, কার ওপর প্রতিশোধ নেবে?

ওরা দু'জনেই চুপ করে গেল।

পুলকেশ আর কিছু জিজ্ঞেস করারও সুযোগ পেলেন না, এর মধ্যে এসে পড়লো

আদিনাথ ও আরও তিন-চারজন। সবাই রুগীর খবর নিতে এসেছে। একই কথা বারবার বলতে বলতে পুলকেশের বিরক্তি এসে গেল।

আদিনাথ একসময় বললো, খুব ভালো হয়েছে স্যার। আপনার আরও ক'দিন বেশি থাকা হবে। আপনার মতন একজন মানুষকে তো এমনিতে ধরে রাখা যায় না—

অন্যরাও এ কথায় সায় দিল।

পুলকেশ ভাবলেন, এরা কি ভাবছে, তাঁর অসুখটা এমন কিছুই নয়? তিনি যেন অসুখের ভান করে এখানে রয়ে গেলেন আরও কয়েকটা দিন!

রহস্যময় অসুখ। কাল রাত্তিরে প্রায় মুমূর্ষু অবস্থা। আজ সম্পূর্ণ সুস্থ। পুলকেশের এখানে থেকে যাওয়ার একটুও ইচ্ছে ছিল না, একদিনেই যথেষ্ট দেখা হয়েছে। কলকাতায় তাঁর জরুরি কাজ আছে, বিজ্ঞাপনের দুটি কপি ছেড়ে দেবার কথা, পত্রিকার জন্য একটা ছোট গল্প লিখতে হবে...

পেটের ব্যথাটা কাল্পনিক? মীনাক্ষীর আত্মা তাঁর পেটের ব্যথার স্বপ্ন দেখিয়ে তাঁকে এখানে আটকে রাখলো?

এ রকম উদ্ভট চিন্তা তাঁর মাথায় আসছে দেখে তিনি নিজেই অবাক হয়ে গেলেন। কোনোদিন তিনি আত্মা কিংবা পরলোকে বিশ্বাস করেননি। তাঁর অবচেতন মন মীনাক্ষীর আত্মহত্যা নিয়ে একটা গল্প বানাচ্ছে।

সুপ্রিয়া এসে সবাইকে তাড়া দিয়ে বললো, আপনারা ওঁকে দিয়ে এত কথা বলাবেন না। কাল যে অবস্থায় এসেছিলেন, আপনারা তো দেখেননি। আজ পুরো বিশ্রাম দরকার। এখন খাওয়াদাওয়া করে ঘুমোবেন।

সবাই আস্তে আস্তে বিদায় নিল। জয়া আর নীতিসুধার একটুও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না, আজ স্কুল ছুটি, ওরা পুলকেশের সঙ্গে গল্প করতে চায়।

পুলকেশ ওদের মনের ভাব বুঝে বললেন, তোমরা বরং বিকেলের দিকে আবার এসো। এক সঙ্গে চা খাওয়া যাবে।

পাতলা ঝোল ভাতের বদলে ডাল-তরকারি-বেগুন ভাজা, দু'রকম মাছের ঝোল সাজিয়ে দিয়েছে সুপ্রিয়া। পুলকেশের পেটে বেশ খিদে আছে। কিন্তু সাবধানে থাকার জন্য তিনি শুধু একটা মাছের ঝোল আর ভাত ছাড়া অন্য কিছু খেলেন না।

খাবার টেবিলে বিকাশ অনুপস্থিত। খেলোয়াড় মানিক বিশ্বাসের বাড়িতে তার দুপুরে নেমন্তন্ন, অনেক আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে।

পুলকেশ সুপ্রিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বুঝি প্রায়ই এখানে চলে আসেন?

সুপ্রিয়া বললো, না, বছরে বড়জোর একবার কি দু'বার। আমি সিউড়িতেই থাকি, ওখানে শ্বশুর-শাশুড়ী আছেন, ছেলের পড়াশুনো—। ও এখানে থাকে সপ্তাহে তিন দিন। এখানকার লোকজন ওকে ছাড়তে চায় না।

—এখানে মীনাক্ষী নামে একজন টিচার ছিল, তাকে চিনতেন?

—না, দেখিনি কখনো। শুনেছি তার কথা। রিসেন্টলি আত্মহত্যা করেছে। আপনি তার কথা জানলেন কী করে?

—আমার সঙ্গে একবার শান্তিনিকেতনে আলাপ হয়েছিল। আমাকে চিঠি লিখতো।

—কেন যে মানুষ আত্মহত্যা করে? একরকমের জীবন পছন্দ না হলে অন্যরকম-ভাবে আবার জীবন শুরু করলেই পারে।

—আত্মহত্যা মানেই তো যুক্তি হারিয়ে যাওয়া। মানুষের খুব যখন রাগ কিংবা অভিমান হয়, তখন আর যুক্তির খেয়াল থাকে না। প্রায় পাগলামির স্তরে পৌঁছে যায়।

—আপনার দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যেস আছে? আমি দরজা বন্ধ করে রাখবো, বিকেল পাঁচটার আগে কারুকে আসতে দেবো না।

—আপনি দুপুরে কী করবেন?

—বই পড়বো। আপনার উপন্যাসটাই এখনো শেষ হয়নি। আমি দুপুরে একদম ঘুমোতে পারি না।

পুলকেশের ইচ্ছে করছিল আরও কিছুক্ষণ সুপ্রিয়ার সঙ্গে গল্প করতে। কিন্তু সুপ্রিয়া উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চলুন!

বিছানায় শুয়ে পুলকেশ একটা সিগারেট ধরালেন।

এরকম অবস্থায় তিনি আগে কোথাও থাকেননি। এটা ঠিক হাসপাতাল নয়, আবার বাড়িও নয়। ডাক্তারের অস্থায়ী আস্তানা। এদের আর অন্য ঘর নেই। লোহার খাটটা রুগীদের খাট, অথচ পুলকেশ এখন সুস্থ, তিনি এ বাড়িতে অতিথি। ভুবন সরকারের বাড়ি থেকে তাঁর জিনিসপত্র একজন পৌঁছে দিয়ে গেছে একটু আগে।

হঠাৎ মনে হলো, ঘরের মধ্যে আর কেউ আছে।

ঘুমিয়ে পড়েননি, এখনও পুরোপুরি জেগেই আছেন পুলকেশ। তবু এরকম মনে হচ্ছে কেন? দরজা বন্ধ, দুটো জানলা খোলা, জানলায় শিক বসানো, পাশের খাটটি শূন্য, আর কেউ নেই তা তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তবু মনে হচ্ছে কেন, কেউ যেন তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

না। নেই, কেউ নেই, কেউ নেই।

কলকাতায় পুলকেশের লেখার টেবিলে হঠাৎ একটা ঠিকানা লেখা টুকরো কাগজ উড়ে এসে পড়েছিল। তারপরেই চকবাজারের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ। মীনাক্ষীর কথা মনে পড়ার পর এখানে এসে শুনলেন সে আত্মহত্যা করেছে। এর মধ্যে কি কোনো যোগাযোগ আছে? কিংবা সবটাই কাকতালীয়?

মীনাক্ষী যেদিন আত্মহত্যা করে ঠিক তার পরের দিনই কি তার হাতের লেখা ঠিকানার কাগজটা পুলকেশের চোখে পড়েছিল? যারা ভূত-প্রেত-আত্মার গল্প বিশ্বাস করে, তাদের কাছে এটা রোমাঞ্চকর সত্য মনে হতে পারে, কিন্তু পুলকেশ কিছুতেই মানতে রাজী নন।

এরকম কিছু কিছু আকস্মিক ব্যাপার তো মিলে যেতেই পারে।

পুলকেশের এক বউদি মারা যান দু'বছর আগে। তখন পুলকেশ বম্বেতে ছিলেন একটা সেমিনারে। এই বউদি ছিলেন পুলকেশের বন্ধুর মতন। বম্বেতে সকালবেলা বউদির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল হঠাৎ। দাদা-বউদি বম্বেতে একসময় বেশ কিছুদিন ছিলেন সেই সূত্রে, তারপর সেমিনারে একজন বাঙালি অধ্যাপিকা আলাপ করতে এসে বউদির কথা জিজ্ঞেস করলেন, তিনি বউদিকে চিনতেন। সেদিনই সন্ধ্যেবেলা টেলিফোনে বউদির মৃত্যুসংবাদ এলো। এটা কি টেলিপ্যাথি না আকস্মিকতা? বাবার মৃত্যুর সময়ও পুলকেশ কাছে থাকতে পারেননি। তখন তিনি ছিলেন আসামে, কই সেদিন তো একবারও মনে পড়েনি বাবার কথা। বউদি এর পর স্বপ্নেও দেখা দেননি।

প্রায় আধ ঘণ্টা জেগে রইলেন পুলকেশ। সর্বক্ষণই মনে হতে লাগলো, ঘরের মধ্যে আর একজন কেউ আছে। যেন তার মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে। পুলকেশ মনে মনে বলতে লাগলেন, আমি জেগে থাকা অবস্থায় যদি মীনাক্ষীকে দেখতে পাই, তবে আমি পরলোক কিংবা আত্মার অস্তিত্ব মানবো। কই মীনাক্ষী, তুমি যদি ঘরের মধ্যে এসে থাকো, তা হলে সশরীরে দেখা দাও! তোমাকে দেখলে আমি ভয় পাবো না! ভয়ের কী আছে? একটি তরুণী মেয়েকে দেখে আমি ভয় পাবো কেন?

একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি ছাড়া কিছুই দেখা গেল না। পুলকেশ বললেন, জানতুম, দেখা যাবে না। দেড় মাস আগে মৃত একটি মেয়েকে যদি সশরীরে আবার দেখা যেত, তা হলে এতকাল ধরে বিজ্ঞানের যে-টুকু অগ্রগতি হয়েছে, তা মিথ্যে হয়ে যেত।

মনই নানারকম উদ্ভট জিনিস তৈরি করে। মনের সব রহস্য এখনো বিজ্ঞান জানে না।

সশরীরে মীনাক্ষীকে দেখা তো দূরের কথা, এমনকি একটু ছায়া কিংবা শব্দও শোনা গেল না।

আস্তে আস্তে পুলকেশের চোখ বুঁজে এলো।

এবার তিনি দেখতে পেলেন মীনাক্ষীকে। সে হাঁটছে একজন পুরুষের সঙ্গে। দু'জনেই পেছনফেরা। সামনেই একটা ছোটখাটো নদী।

স্বপ্নের মধ্যেই পুলকেশ ভাবলেন, এই দৃশ্যটা আমার দেখে লাভ কী?

মীনাক্ষীর বোধহয় কারুর সঙ্গে একটু-আধটু প্রেম ছিল, নদীর ধারে তার সঙ্গে বেড়িয়েছে, আজকাল মফস্বলেও কেউ এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। ওরা পেছন ফিরে রয়েছে কেন? মীনাক্ষীকে চেনা যাচ্ছে, পুরুষটিকে চেনা যাচ্ছে না।

এখানকার নদীটা দেখা হয়নি। সময় পেলে একবার ঘুরে আসতে হবে।

মীনাক্ষী কি কাঁদছে না হাসছে? মাথা দোলাচ্ছে।

নাঃ, পুলকেশ এই স্বপ্নটা দেখতে চান না। তিনি পাশ ফিরে শুলেন।

পাতলা ঘুম, এক একবার পুলকেশ সজাগ হচ্ছেন, এক একবার ডুবে যাচ্ছেন স্বপ্নে।

তিনি খুব বেশি স্বপ্ন দেখেন। পেটে গ্যাস হলে নাকি বেশি স্বপ্ন দেখে মানুষ। ঊর্মিলা এত স্বপ্ন দেখে না। কিংবা স্বপ্ন দেখে, জেগে ওঠার পর মনে থাকে না। পুলকেশের সব স্বপ্নই মনে থাকে, তাঁর দুটো উপন্যাসের প্লট পেয়েছেন স্বপ্ন থেকে।

কাল থেকে শুধু মীনাক্ষীকেই স্বপ্নে দেখছেন কেন? মেয়েটি সামান্য চেনা। অথচ স্বপ্নে সে ফিরে আসছে বারবার।

এর পরের স্বপ্নটা দেখে পুলকেশ স্বপ্নের মধ্যেই খুব অবাক হলেন। জ্যোৎস্নামাখা রাত, দু'পাশে গাছপালার মধ্য দিয়ে একটা রাস্তা, অন্ধকার আর জ্যোৎস্নার জাফরি কাটা, সেখান দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছে একজন মানুষ, সে দু'হাতে পাঁজাকোলা করে নিয়ে আসছে একটি মেয়েকে। ছোটুলাল আর মীনাক্ষী। মীনাক্ষী যেন পরম আরামে ঘুমোচ্ছে। এ কী! ছোটুলাল মীনাক্ষীকে কোলে করে আনবে কেন রাত্তিরবেলা? তবে কি এ বাড়ির কাজের লোক ছোটুলালের সঙ্গে গোপন প্রেম ছিল মীনাক্ষীর?

ছোটুলাল জোর করে ধরে নিয়ে আসছে তাও মনে হয় না। মীনাক্ষী ছোটুলালের বুকের কাছে মুখ গুঁজে আছে। প্রতিবাদে হাত-পা ছুঁড়ছে না।

না, না, কাজের লোকের সঙ্গে প্রেম করা যাবে না, এমন শুচিবাই নেই পুলকেশের। তিনি জাতিভেদ, উঁচু-নিচু ভেদ মানেন না। এক সরল, মুসলমান মাঝির সঙ্গে একটি বিলেতফেরত মহিলার প্রেমের কাহিনী তো তিনি নিজেই লিখেছেন। ছোটুলালের চেহারা-টেহারা ভালোই তো, সে কেন প্রেমিক হতে পারবে না? কিন্তু সকালবেলাতেই ওর মুখে মদের গন্ধ পাওয়া গেছে, একঘেয়ে সুরে কথা বলে, এর সঙ্গে কী কথা বলতো মীনাক্ষী? সে একটা শিক্ষিতা মেয়ে, সাহিত্য ভালোবাসতো।

এটা একটা উদ্ভট স্বপ্ন, মাথামুণ্ডু নেই।

পুলকেশ একবার স্বপ্ন দেখেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী একটা মাঠের মধ্যে চিন্তিতভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। একসময় পুলকেশের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, আমি ঐ সামনের পুকুরটায় একটু স্নান করবো ভাবছি। আমাকে একটা তোয়ালে দিতে পারো?

শুধু এইটুকুই। এ স্বপ্নের কোনো তাৎপর্য আছে? ঊর্মিলাকে এই স্বপ্নের কথা বলতে সে হেসে কুটিকুটি হয়েছিল। সত্যিই তো হাসির কথা। ডজন ডজন সিকিউরিটি গার্ড ছাড়া ইন্দিরা গান্ধী এক পা বেরুতে পারতেন না, তিনি মাঠের মধ্যে একলা দাঁড়িয়ে পুলকেশের কাছে তোয়ালে চাইবেন?

পুলকেশের মাথায় এরকম উদ্ভট স্বপ্ন আসে। ছোটুলালের সঙ্গে মীনাক্ষীর গোপন প্রেমও সেইরকম অর্থহীন চিন্তা।

পুলকেশ উঠে বসলেন। নাঃ, এরকম বাজে বাজে স্বপ্ন তিনি আর দেখতে চান না। ঘুমোবারও দরকার নেই। দুপুরটা কাটবে কী করে?

শরীর একেবারে সুস্থ। পুলকেশ ঠিক করলেন, আজ ফেরা হলো না, কাল সকালের

ট্রেনেই তিনি চলে যাবেন। অসুখ সম্পর্কে তাঁর তেমন ভয় নেই, কলকাতায় গিয়ে একবার চেক আপ করিয়ে নিলেই হবে। এখানে আর সময় নষ্ট করবার কোনো মানে হয় না।

খাট থেকে নেমে একটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি জানলার কাছে দাঁড়ালেন।

বাগানে কাজ করছে ছোটুলাল। খালি গা, একটা শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। পিঠ চকচক করছে ঘামে। এই লোকের সঙ্গে একটি ছিপছিপে তরুণী, স্কুলের শিক্ষিকার প্রেম হতে পারে? এরকম ছোট জায়গায় জানাজানি হবেই, কেউ মানবে না।

পুলকেশের ইচ্ছে করলো ছোটুলালের সঙ্গে গল্প করতে। চোখাচোখি হলে হাতছানি দিয়ে ডাকবেন। কিন্তু ছোটুলাল এদিকে তাকাচ্ছেই না। একমনে মাটি খুঁড়েই চলেছে।

পুলকেশ দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

ভেতরের একটা ঘরের থেকে সুপ্রিয়ার গলায় মৃদু গান শোনা যাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে পুলকেশ গানটা শুনলেন। বেশ সুরেলা গলা সুপ্রিয়ার। ঘুমপাড়ানি গান গাইছে, 'আয় ঘুম, যায় ঘুম দত্ত পাড়া দিয়ে, দত্তদের বউ পান সেজেছে এলাচ দানা দিয়ে...'

বিল্টুকে ঘুম পাড়াচ্ছে সুপ্রিয়া। কোনো মায়ের গান গেয়ে ছেলেকে ঘুম পাড়ানোর মতন সুন্দর দৃশ্য খুব কমই আছে। পুলকেশ একবার ভাবলেন, উঁকি দিয়ে দৃশ্যটা দেখে আসবেন। তারপরই ভাবলেন, এদের সঙ্গে তাঁর নতুন পরিচয়, এ ভাবে উঁকি দেওয়াটা ভালো দেখায় না।

তিনি বেরিয়ে এলেন বাগানে।

ঠিক তখনই ছোটুলাল উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগলো একটা ছোট ঘরের দিকে। বাগানের এক কোণে ঐ ঘরটাতেই বোধহয় ছোটুলাল থাকে।

পুলকেশ একবার ওর নাম ধরে ডাকলেন, ছোটুলাল শুনতে পেল না, ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে।

পুলকেশ হাঁটছেন, তাঁর মাথা আর টলটল করছে না। কাল রাতে মনে হচ্ছিল তিনি মরেই যাচ্ছেন। কী বিচিত্র পেটব্যথা!

ছোটুলাল বোধহয় টের পেয়ে গিয়েছিল যে পুলকেশ তার দিকেই আসছেন। ঘরের মধ্যে একেবারে শেষের দেওয়াল ঘেঁষে সে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা দিশি মদের বোতল। তার থেকে ঢকঢক করে বেশ খানিকটা চুমুক দিল। সারাদিনই সে ঘুরে ফিরে মদ খায়? ডাক্তার সেজন্য বকে না?

দু'দিকের কষ বেয়ে মদ গড়াচ্ছে। বাঁ হাতের তালু দিয়ে তা মুছে নিয়ে সে জ্বলজ্বলে চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো। তারপর অদ্ভুতভাবে হেসে জিজ্ঞেস করলো, কী বাবুসাহেব, ঐ ঘরে শুতে আপনার ডর লাগছে?

পুলকেশ ভ্রু কুঁচকে বললেন, কেন, ডর লাগবে কেন?

ছোটুলাল বললো, ঐ ঘরে রুগী মরেছে। মাস্টার দিদিমণি সেদিন মরে গেল।

—কে মরে গেল?

ছোটুলাল চুপ করে গেল।

—মাস্টার দিদিমণি মানে....কোন্ মাস্টার দিদিমণি?

ছোটুলাল আবার বোতলে চুমুক দিল।

পুলকেশ ঠিক বুঝতে পারলেন না ব্যাপারটা। ঐ ঘরে মাস্টার দিদিমণি মারা গেছে, তার মানে কে, মীনাক্ষী? কিন্তু তাকে তো পাওয়া গেছে নদীর ধারে।

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, ছোটুলাল, এখানে মীনাক্ষী নামে স্কুলের এক দিদিমণি ছিলেন, তুমি কি তাঁর কথা বলছো?

ছোটুলাল তীব্র চোখে তাকিয়ে রইলো, কোনো কথা বললো না।

ক'জন স্কুলের দিদিমণি মারা গেছে এর মধ্যে? মীনাক্ষী ছাড়া, আরও কেউ? সেরকম কিছু শোনা যায়নি তো? অল্প সময়ের মধ্যে পরপর দু'জন মারা গেলে নিশ্চয়ই তা নিয়ে আলোচনা হতো। বিকেলে জয়ারা এলে জিজ্ঞেস করতে হবে।

পুলকেশ ছোটুলালের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, সেইজন্য তুমি আমার বিছানাটা অন্য খাটে বদলে দিলে? জানলার ধারের খাটটায় কেউ মারা গিয়েছিল?

ছোটুলাল যেন বোবা হয়ে গেছে।

পুলকেশ বললেন, হাসপাতাল-নার্সিংহোমের খাটে কেউ না কেউ মারা যায়, তাতে ভয় পাবার কী আছে?

ছোটুলাল যেন আর কোনো কথাই বলবে না, প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছে। অন্যভাবে তাকে দিয়ে কথা বলাবার জন্য পুলকেশ প্রসঙ্গ বদল করে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা ছোটুলাল, তুমি এখানে কত দিন কাজ করছো?

ছোটুলাল তবু চুপ করে রইলো। আবার সে চুমুক দিল মদের বোতলে। এই শ্রেণীর লোক সাধারণত বাবুশ্রেণীর লোকদের একেবারে সামনা-সামনি মদ খায় না। কিছুটা সমীহ করে। কিন্তু ছোটুলাল পুলকেশকে গ্রাহ্য করছে না। সকালবেলা ও অত কথা বলছিল, এখন সে মুখে কুলুপ এঁটে ফেলেছে।

আর এখানে থেকে লাভ নেই, তাই পুলকেশ বাগানে ঘুরতে লাগলেন। বাগান বলতে তেমন কিছু না, যদিও অনেকটা জমি। একদিকে কিছু ফুলের গাছ, আর একদিকে লঙ্কা আর বেগুন গাছের চারা লাগানো হয়েছে।

গেট দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন পুলকেশ। শরীর যখন সুস্থ আছে, পায়ে হেঁটে গ্রামটা একবার ঘুরে দেখা যাক। অবশ্য এই জায়গাটাকে গ্রাম বোধহয় বলা যায় না। রেলস্টেশন আছে, বড় একটা বাজার আছে। এমনকি প্রাইভেট নার্সিংহোম পর্যন্ত রয়েছে।

সঙ্গে কেউ নেই, এটাই ভালো। কোনো একটা নতুন জায়গায় একা একা পায়ে হেঁটে ঘুরলেই ভালো চেনা যায়। হারিয়ে যাবার তো ভয় নেই। ডাক্তারের বাড়ি যে-কেউ দেখিয়ে দেবে।

নদীটা কোন্ দিকে?

এই দুপুরে রাস্তায় লোকজন বিশেষ নেই। একটা-দুটো সাইকেল রিকশা পাশ দিয়ে চলে গেল। কারুকে কিছু জিজ্ঞেস না করে এমনিই হাঁটতে লাগলেন পুলকেশ। অনেক ফাঁকা জমি পড়ে আছে, মাঝে মাঝে এক একটা বাড়ি। একতলা, পাকা বাড়ি। এক জায়গায় আট-দশটা মাটির বাড়ি একসঙ্গে। সেখানে খেলা করছে কতকগুলো বাচ্চা ছেলেমেয়ে। মনে হয় আদিবাসীদের বস্তি।

একটা মস্ত বড় বটগাছের কাছে এসে রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। ডান দিকের রাস্তাটাই বেশি আকর্ষণীয়, দু'দিকে গাছপালায় ঢাকা। পুলকেশ সেই রাস্তাটাই নিলেন।

একটু বাদে নদীর ধারে পৌঁছে গিয়ে তাঁর বেশ আনন্দ হলো। কারুকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হলো না, যেন গন্ধ শুঁকে শুঁকে পেয়ে গেলেন জলের সন্ধান।

খুব ছোট নদী তো নয়। দু'পাশের পাড় বেশ উঁচু, শেষ-শীতেও জলের একটা ধারা আছে, সেই জলে স্রোতও আছে।

খানিকটা দূরে একটা দোতলা বাড়ি দেখা যাচ্ছে, তা ছাড়া কাছাকাছি কোনো জন-বসতি নেই। বেড়াবার পক্ষে ভালো জায়গা, পিকনিকও করা যেতে পারে। গোটা কয়েক মোষ চরাচ্ছে একটা বাচ্চা ছেলে, পুলকেশ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, খোকা, এই নদীর নাম কী রে?

ছেলেটি পুলকেশ সম্পর্কে কোনো কৌতূহল দেখালো না, গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, বক্রেশ্বর।

বক্রেশ্বর? বাংলার বড় বড় নদীর তুলনায় এ নদীটি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তবু কলকাতার খবরের কাগজ-পড়ুয়া মানুষ এই নদীটার নাম জানে। বহু বছর ধরে এই নদীর ধারে কোনো জায়গায় একটা পাওয়ার-জেনারেশান প্রজেক্ট নিয়ে টালবাহানা চলছে। অনেক হাসি-ঠাট্টাও হয় এই বিষয়ে।

অবধারিতভাবে আবার মীনাক্ষীর কথা মনে পড়লো। মীনাক্ষী পুলকেশকে বলেছিল, আমাদের ওখানে আসুন, একটা নদী দেখাবো। মীনাক্ষী এই নদীটাকে ভালোবাসতো, এখানে বেড়াতে আসতো, এই নদীর ধারে শুয়ে শুয়েই সে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেছে।

কোন্ গাছটার নিচে সে শুয়েছিল?

নদীর দু'ধারে তেমন বড় গাছ নেই। কয়েকটা জারুল আর ছাতিম গাছ রয়েছে, আর বেশির ভাগই আগাছা।

একটু পরিষ্কার জায়গা বেছে নিয়ে পুলকেশ দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। এখানে একটা লম্বা গাছ আছে। পাতাগুলো দেখে গাছটা চিনতে পারলেন না। নদী

দেখতে তাঁর ভালো লাগে। ভরা বর্ষায় এলে এই নদীতে তিনি সাঁতার কাটতেন।

পায়ের শব্দ শুনে পেছনে তাকিয়ে দেখলেন একজন মাঝবয়েসী ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন তাঁর দিকে। সিল্কের লুঙ্গির ওপর নকশা করা পাঞ্জাবি গায়ে, মাথায় টাক। লোকটিকে দেখলেই মনে হয়, বেশ অবস্থাপন্ন, ক্ষমতাশালী ধরনের মানুষ।

কাছে এসে তিনি বললেন, নমস্কার, নমস্কার মিস্টার চ্যাটার্জি, আপনি এখানে?

লোকটি সম্পূর্ণ অচেনা, জীবনে কখনো দেখেননি, অথচ উনি পুলকেশকে চেনেন।

লোকটির দু'হাতের আঙুলে ছ'সাতটি আংটি। পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম। তিনি বললেন, আমার নাম গোলাম হোসেন। কাল ইস্কুলের মিটিং-এ আপনার বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম। আপনার সঙ্গে আলাপ করা হয়নি, তাড়াতাড়ি চলে আসতে হলো। আপনি একা একা—

পুলকেশ বললেন, আপনাদের শহরটা দেখতে বেরিয়েছি। বেশ ছিমছাম জায়গাটি।

—আপনার শরীর খারাপ হয়েছিল শুনলাম।

ছোট জায়গায় সবাই সব খবর জেনে যায়।

গোলাম হোসেন নামটা শুনলে সিরাজউদ্দৌল্লা নাটকের একটি চরিত্রের কথা মনে পড়ে যায়। এঁর সঙ্গে অবশ্য সে চরিত্রটার কোনো মিল নেই। ইনি নিজেই পরিচয় দিলেন, ইনি একজন উকিল, সিউড়িতে প্র্যাকটিস করেন, চকবাজারে নিজস্ব বাড়ি, ছুটি-ছাটায় চলে আসেন এখানে।

পুলকেশ বললেন, এই নদীর ধারে বেশি বাড়ি-ঘর হয়নি দেখছি। সেটাই বেশ ভালো। দু'পাশে বাড়ি-ঘরে ঘিঞ্জি হয়ে গেলে নদী দেখতে আর ভালো লাগে না।

গোলাম হোসেন বললেন, এখানে বাড়ি বানাবার বিপদ আছে। প্রায় বছরই বন্যা হয়। অনেক দূর পর্যন্ত ভেসে যায়।

তারপর আঙুল তুলে দূরের দোতলা বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, আমার ফাদার শখ করে ঐ বাড়ি বানিয়েছিলেন। ভিত অনেক উঁচু করা আছে। আটাত্তরের বড় বন্যাতেও ক্ষতি হয়নি।

পুলকেশ বললেন, বাঃ, আপনি তো সুন্দর জায়গায় থাকেন!

—সেইজন্যই তো সিউড়ি থেকে মাঝে মাঝেই পালিয়ে আসি। উকিল মানুষ, চোর-ডাকাত, ঠক-জোচ্চোরদের নিয়েই কারবার, এখানে এলে প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ জুড়োয়।

—এত ফাঁকা জায়গায় বাড়ি, এখানে বুঝি চোর-ডাকাতের ভয় নেই?

—সে ভয় কোথায় নেই? তবে, আমাদের বন্দুকের লাইসেন্স আছে, বাড়িতে দু'খানা বন্দুক, আমার ছোট ভাইটা গোঁয়ার-গোবিন্দ, চোর-ডাকাতরা তাকে ভয় পায়।

—আপনার ছোট ভাই কী করে?

—সে চাষ-বাস দেখে। এমনিতে ভয় নেই, তবে ইদানীং সন্ধ্যের পর অনেকেই নদীর

ধারে আসতে ভয় পায়। কিছুদিন আগে এখানে একটা সুইসাইডের কেস হয়ে গেছে। শুনেছেন বোধহয়, এখানকার স্কুলের এক মাস্টারনী নদীর ধারে আত্মহত্যা করেছে।

ঘুরে ফিরে আবার মীনাক্ষীর কথা এসে গেল। মীনাক্ষী বেঁচে নেই, তবু অধিকাংশ সময়ই সে উপস্থিত।

পুলকেশ বললেন, হ্যাঁ, শুনেছি।

গোলাম হোসেন বললেন, আপনি যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছেন, এর থেকে একটু পেছনে, এই যে মুচুকুন্দ গাছটার গোড়ায় পড়েছিল তার লাশ। আমিই তো প্রথমে দেখি।

—আপনি প্রথম দেখেছিলেন?

—জী। ঘুম থেকে উঠে মর্নিং ওয়াক করা আমার অভ্যেস। দূর থেকেই তার শাড়ির নীল রংটা চোখে পড়েছিল। কাছে এসে দেখি একটি তরুণী মেয়েছেলে শুয়ে আছে। ঠিক যেন মনে হয়, ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু এরকম নির্জন নদীর ধারে কোনো ভদ্রবাড়ির মেয়ের সারারাত ঘুমিয়ে থাকা কি স্বাভাবিক, বলুন? প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল রেপ কেস! গ্রামে-গঞ্জে এরকম তো হয়ই।

—আপনি মেয়েটিকে চিনতে পেরেছিলেন?

—মুখ চেনা ছিল। আমি চ্যাঁচামেচি করতেও চোখ মেললো না।

—তখনো প্রাণ ছিল? এখানকার ডাক্তারের নার্সিংহোমে তাকে চিকিৎসা করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?

—না তো! একেবারে ডেড। কেউ টাচ করেনি। বিকাশ ডাক্তারের আগেই এসেছিল আর একজন, ডাক্তার মনোমোহন কয়াল, সে কাছেই থাকে, সে অবশ্য হোমিওপ্যাথ, কয়াল ডাক্তারই বললো, বেঁচে নেই। তারপর বিকাশ এলো। বিকাশ আমার বন্ধু লোক। সে দেখে ডেথ সম্পর্কে সিওর হয়ে বললো, লাশ এখান থেকে সরানো যাবে না। পুলিশ এসে পৌঁছোলো দেড় ঘণ্টা পরে। ততক্ষণ লাশ পাহারা দেওয়া হয়েছে। আমার বাড়ি থেকেই একটা চাদর এনে ঢাকা দিয়ে রেখে দিলাম। মেয়েছেলের লাশ তো।

—কোনো সুইসাইড নোট পাওয়া গেছে? বোঝা গেল কী করে যে আত্মহত্যা?

—সেসব পুলিশ জানে। নাঃ, কাগজ-টাগজ তো কিছু ছিল না। পুলিশ রিপোর্টেই বলেছে আত্মহত্যার কেস। ভেরি স্যাড। মেয়েটি দেখতে শুনতে ভালো ছিল, পড়াতোও ভালো।

—স্কুল কমিটি নাকি মেয়েটিকে চাকরি থেকে ছাড়াবার নোটিশ দিয়েছিল?

—তাই নাকি? তাই নাকি? সেসব তো আমি জানি না। আমি ব্যস্ত থাকি, নিজের ঝামেলা নিয়ে। মিস্টার চ্যাটার্জি, চলুন না, আমাদের বাড়িতে একটু চা খেয়ে যাবেন। ছেলেমেয়েরা আপনার মতন একজন বড় রাইটারকে পেলে খুশি হবে। আমি বাংলা বই পড়ার সময় পাই না। আমার ছোট মেয়েটা খুব বই পড়ে, আপনার বইও দু'একখানা পড়েছে নিশ্চিত, কালকের ফাংশানে আমার মেয়ে আবৃত্তি করেছে। চলুন, চলুন।

পুলকেশ হাত জোড় করে বললেন, না, আর বেশি দেরি করা বোধহয় ঠিক হবে না। আমি ডাক্তার বিকাশ নন্দীর পেশেন্ট, আমাকে শুয়ে থাকতে বলা হয়েছিল। কারুকে কিছু না জানিয়ে চলে এসেছি। এবার ফেরা উচিত।

গোলাম হোসেন সাহেব আরও একটু পীড়াপীড়ি করে হাল ছেড়ে দিলেন।

তিনি একটুখানি এগিয়ে দিতে এলেন পুলকেশকে।

লম্বা গাছটার দিকে দেখিয়ে পুলকেশ জিজ্ঞেস করলেন, এটা মুচুকুন্দ গাছ? ফুলটার নাম শুনেছি, গাছটা চিনতাম না। বেশ মিষ্টি গন্ধ হয়, তাই না?

গোলাম হোসেন বললেন, জী। সরবতের মধ্যে কয়েকটা পাপড়ি ফেলে দিলে খেতে দিব্যি লাগে। এ তল্লাটে এই গাছ একটাই আছে। আর দেখিনি।

মাটি থেকে একটা শুকনো ফুল কুড়িয়ে নিলেন গোলাম হোসেন। পুলকেশ দেখেই চিনতে পারলেন। সুপ্রিয়া তাঁরই লেখা যে বইটি পড়ছিল, সেই বইয়ের ভাঁজে এরকম একটা শুকনো ফুল ছিল।

॥ ৬ ॥

জয়া কিংবা নীতিকে একলা পাওয়া গেল না। পুলকেশের খুব ইচ্ছে ছিল ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ নিভৃতে কথা বলার। কয়েকটা ব্যাপারে কৌতূহল তাঁর মনের মধ্যে টগবগ করছে।

পুলকেশ ফেরার আগেই একদল বসেছিল তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য। আরও দলে দলে এলো। গতকাল এখানকার প্রবীণ ও বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গেই পুলকেশকে বেশি সময় কাটাতে হয়েছে, আজ এলো তরুণ-তরুণীরা। এদের মধ্যে কয়েকজন আবার কবিতা-গল্প লেখে।

নিজেরাই ঠিক করে এসেছে পুলকেশকে তারা আজ নিজেদের লেখা পাঠ করে শোনাবে। একজন সরাসরি বলেই ফেললো, সে কলকাতার অনেক পত্রিকায় লেখা পাঠিয়েছে, একটাও ছাপা হয়নি, সম্পাদকরা উত্তরও দেন না। পুলকেশকে লেখা ছাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

অনেক জায়গাতেই পুলকেশকে এইরকম কথা শুনতে হয়। লেখা ছাপাবার ব্যাপারে যে তাঁর কোনো হাত নেই, এ কথা বলারও কোনো মানে হয় না। তিনি বললেন, পড়ো, তোমাদের লেখা পড়ো।

তিনজন কবিতা পাঠ করার পর একজন মাঝবয়েসী লোক পড়তে শুরু করলো একটা লম্বা গল্প। তার গলা আবার খোনা খোনা, অনেক কথাই বোঝা যায় না।

গল্প শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন পুলকেশ।

এখানে একবারও মীনাক্ষীর নাম উচ্চারিত হয়নি। তবু তাঁর মনে পড়তে লাগলো মীনাক্ষীর কথা। মীনাক্ষী তাঁকে নদী দেখাতে চেয়েছিল, নদীটা দেখা হয়ে গেল। মীনাক্ষী

বেঁচে থাকলে ঐ নদীর ধারে বসে অনেকক্ষণ গল্প করা যেত। মেয়েটি রোমান্টিক ছিল খুব, আত্মহত্যাও করলো নদীর ধারে গিয়ে।

ছোটুলাল শুধু শুধু তাঁকে ভয় দেখাতে গেল কেন? দুটো কথা বলে চুপ করেই বা গেল কেন একেবারে? মাতালের কাণ্ড! স্বপ্নে ছোটুলালকে দেখাটাও মিলছে না।

আজ রাত্তিরটা কোনোক্রমে কাটলে বাঁচা যায়। বোঝাই যাচ্ছে, ঐ ঘরে শুলে ভালো ঘুম হবে না। একই স্বপ্ন দেখতে হবে বারবার। মীনাক্ষীর মৃত্যুর ব্যাপারটা তাঁর মনে গেঁথে গেছে। তাঁর অবচেতন মন একটি তরুণীর আত্মহত্যা নিয়ে কাহিনী বানাতে চাইছে। স্বপ্নের সেই কাহিনীর মধ্যে মীনাক্ষী ব্যাকুলভাবে বলছিল, আমি মরতে চাই না, আমি বেঁচে থাকতে চাই।

গল্প পাঠ শেষ হতেই পুলকেশ বললেন, বাঃ, বেশ হয়েছে। চমৎকার হয়েছে। একটু ছোট করলে ভালো হয়।

গল্পপাঠক ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলো, কোন্ জায়গাটা? কোন্ জায়গাটা?

পুলকেশ আন্দাজেই বললেন, শেষটা ভালো, মাঝখানে একটু ফেনানো হয়েছে।

অন্য কয়েকজনও বললো, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। গল্পটা বড্ড বড়।

গল্পপাঠকটি বললো, স্যার, আপনারাও তো অনেক বড় বড় গল্প লেখেন।

এ কথার কী উত্তর দেওয়া যায়? পুলকেশ শুধু হাসলেন।

তারপর মুখ তুলে আদিনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি কিন্তু কাল সকালের ট্রেনেই ফিরবো। স্টেশনে গিয়ে টিকিট কাটলেই তো চলবে?

আদিনাথ বললো, সে কি স্যার! আপনি দু'-তিন দিন থাকবেন, পাশের গ্রাম পলাশডাঙায় ওরা আপনাকে একটা সম্বর্ধনা দিতে চাইছে। আমি কথা দিয়ে ফেলেছি।

পুলকেশের মুখের রেখা কঠিন হয়ে গেল। তিনি বলতে চাইলেন, আমার হয়ে আপনার কথা দেবার কী অধিকার আছে?

কিন্তু বাইরে এসে এরকম কড়া কথা বললে গণ্ডগোল হতে পারে। যদি জোর করে আটকে দেয়!

তিনি নিরস গলায় মাথা নেড়ে বললেন, না, সম্ভব নয়। কালই আমায় যেতে হবে।

সুপ্রিয়া বসেছিল সবার পেছন দিকে। সে বললো, আমাদের এখানে বুঝি আর ভালো লাগছে না?

সুপ্রিয়া মেয়েটিকে বেশ পছন্দ হয়েছে পুলকেশের। কিন্তু শুধু তো সুপ্রিয়ার আতিথ্য নয়, আরও একদিন থাকলে এখানে এরকম ভিড় লেগেই থাকবে। আরও গল্প-কবিতা শুনতে হবে।

তিনি বললেন, শরীর তো ঠিক হয়ে গেছে। কলকাতায় অনেক কাজ পড়ে আছে। মনটা খচখচ করছে। আবার আসবো।

—না, আপনি আর আসবেন না। সবাই এরকম বলে।

—আপনারা কলকাতায় গেলে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

কবিতা ও গল্প লেখক দু'তিনজন বলে উঠলো, স্যার, আমরাও কলকাতায় গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করবো। আপনার ঠিকানাটা দিন।

সুপ্রিয়া বললো, আপনাকে সিউড়িতে ডাকলে আসবেন? তা হলে ওখানে একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

পুলকেশ বললেন, হ্যাঁ, আসবো।

এই সময় একজন লোক এসে একটা চিঠি দিল। চিঠিটা পাঠিয়েছেন রমেশ সিকদার। তিনি লিখেছেন ঃ

পুলকেশবাবু,

আপনার শরীর সুস্থ আছে শুনলাম। শুনে আশ্বস্ত বোধ করেছি। সন্ধ্যাকালটা কিভাবে যাপন করবেন? আপনার কি সন্ধ্যা-আহ্নিকের অভ্যেস আছে? তা হলে আমার এখানে আচমন করে যেতে পারেন। এখানকার বুভুক্ষু ছেলেমেয়েরা আপনাকে হাজার প্রশ্ন করে ছিঁড়ে খাবে। আমার বাড়িতে একটা সুবিধে, এখানে বাইরের লোক প্রবেশ করে না। মনস্থির করে পত্রবাহককে জানান। ইতি—

ভবদীয়

রমেশ সিকদার

পাকা হাতের লেখা, নির্ভুল বানান, ভাষারও বাঁধুনি আছে। এই লোকটি শিক্ষিত। চিঠির অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতটাও বুঝতে অসুবিধে হলো না পুলকেশের।

তিনি পত্রবাহককে বললেন, হ্যাঁ, যাবো। ওঁর বাড়িটা কত দূর?

রমেশ সিকদারের বাড়ি অন্য দিকে, এখান থেকে খানিকটা দূর আছে। পুলকেশ চট্টোপাধ্যায়ের মতন বিশিষ্ট অতিথি সন্ধ্যেবেলা হেঁটে যাবেন, তা হতেই পারে না। একটা সাইকেল রিকশা ডাকা হলো।

পুলকেশ সভা ভঙ্গ করে রিকশায় উঠে সকলের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর জয়াকে বললেন, তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

জয়া যেন এটাই চাইছিল, বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে বসলো।

আকাশ বেশ পরিষ্কার, সদ্য জ্যোৎস্না ফুটেছে, হাওয়ায় ফিনফিনে ভাব। সামান্য ঠাণ্ডার আমেজ।

জয়া বললো, আমি আপনার সঙ্গে এক রিকশায় বসে যাচ্ছি, বাড়িতে চিঠি লিখলে কেউ বিশ্বাস করবে না।

পুলকেশ একটা ভদ্রতার হাসি দিলেন।

জয়া আবার বললো, মীনাক্ষী থাকলে ও আমাকে কিছুতেই বসতে দিত না। আপনি কিছু বলার আগেই ও উঠে বসতো। ও পাগলের মতন ভালোবাসতো আপনার লেখা।

শুধু আপনার লেখা নয়, আপনাকেও। আপনি কখন কোথায় যান, কোন্ কাগজে আপনার সম্বন্ধে কিছু বেরিয়েছে, সব ও খবর রাখতো। অথচ কলকাতায় গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতো না।

—লেখকদের সঙ্গে বেশি দেখা না হওয়াই ভালো। তাতে মোহভঙ্গ হতে পারে।

—আরও অনেক মেয়ে নিশ্চয়ই আপনাকে চিঠি দেয়, আপনার সঙ্গে দেখা করে। আপনার স্ত্রী রাগ করেন না?

—আমার স্ত্রী মাঝে মাঝে আমার ওপর রাগ করে নিশ্চয়ই। তবে, এই কারণে নয়। কোনো কোনো পাঠিকার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়ে যায়। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, মীনাক্ষীর এখানে একজন প্রেমিক ছিল নিশ্চয়ই?

—আপনি কী করে জানলেন?

—আন্দাজ করছি। ওরকম একটি সপ্রতিভ, রোমান্টিক ধরনের মেয়ে...ছিল না?

—ছিল।

—কে?

—জয়া চুপ করে গেল। একটু বাদে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আর ওসব কথা তুলে কী হবে! মেয়েটা চলেই গেল।

হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতন স্বপ্নের দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল পুলকেশের। মীনাক্ষী আর একজন পুরুষ পাশাপাশি যাচ্ছে। পুরুষটির পিঠ ফেরানো। তবু এবার তিনি পুরুষটিকে চিনতে পারলেন।

তিনি বললেন, বিকাশ ডাক্তার?

জয়া মুখ ফিরিয়ে পুলকেশের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

পুলকেশ জিজ্ঞেস করলেন, ঠিক বলেছি, তাই না? বিকাশ যে বিবাহিত, তা সে জানতো না?

—জানতো।

—তবু এই ভুল করেছিল কেন?

—আমরা ওকে অনেকভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ও পাগলের মতো প্রেমে পড়েছিল। ও বলতো, আমি তো বিকাশের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান চাই না। বিয়ের কথাও ভাবি না। অন্ধ প্রেম যাকে বলে।

—দূর থেকে ভালোবাসা? নাকি ঘনিষ্ঠতা ছিল অনেকখানি?

—সন্ধ্যের পর মীনাক্ষী প্রায়ই বেরিয়ে গিয়ে দেখা করতো। নদীর ধারে গিয়ে বসতো। বিকাশের কোয়ার্টারেও গেছে। ডাক্তারের বউ তো এখানে আসেই না প্রায়। যখন দু'একবার এসেছে, তখন মীনাক্ষী ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে গেছে। অন্য সময়ে ডাক্তারের কোয়ার্টারে যাবার কোনো অসুবিধেই ছিল না। আমার ধারণা, ওদের মধ্যে সব কিছুই হয়েছে। আমি মীনাক্ষীকে পিল খেতে দেখেছি। ছ'সাত বছর ধরে ওদের এই সম্পর্ক।

সম্পর্কটা এবার স্পষ্ট হতে লাগলো পুলকেশের কাছে। মীনাক্ষী অতি রোমান্টিক, ভবিষ্যতের চিন্তা করেনি, ডাক্তারকে সে ভালোবেসেছে, ভালোবাসাটাই তার কাছে যথেষ্ট। ডাক্তারের পক্ষে ব্যাপারটা বেশ সুবিধেজনক। সিউড়িতে নিজের সুন্দরী স্ত্রী, আর এখানেও একজন একনিষ্ঠ প্রেমিকা। এই প্রেমিকার কোনো দায়িত্বও নিতে হবে না। তবু এই ধরনের সম্পর্ক খুব বেশিদিন টেঁকে না। জানাজানি হয়ে যায়, সংসার ভাঙার সম্ভাবনা যাতে না দেখা দেয়, সেইজন্য প্রেমিকাটিকে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়। সেইজন্যই কি এই স্কুলের চাকরি থেকে মীনাক্ষীকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছিল? স্কুল কমিটির ওপর ডাক্তারের নিশ্চয়ই প্রভাব আছে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, শেষের দিকে কি ওদের সম্পর্কটা ভালো যাচ্ছিল না?

জয়া বললো, তা ঠিক বলতে পারবো না। মীনাক্ষী এই ব্যাপারে খুব চাপা ছিল। বিকাশের সঙ্গে ওর প্রেমটা আমি সমর্থন করিনি বলে আমাকে কিছুই বলতো না। তবে ইদানীং প্রায়ই ও খুব মন খারাপ করে থাকতো। একলা একলা কাঁদতো। তাতেই মনে হয়—

—ঘুমের ওষুধ খেলে মানুষ তো সঙ্গে সঙ্গে মরে না। একদিন-দু'দিন বেহুঁশ হয়ে থাকে। মীনাক্ষীর কোনো চিকিৎসা হয়নি?

—না, হয়নি। সন্ধ্যেবেলা ও আমাকে বললো, একটু ঘুরে আসছি। এরকম তো প্রায়ই যেত। সেদিন বৃষ্টি পড়ছিল। রাত্রে আর ফিরলোই না। আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল, আবার ভাবছিলাম হেড মিস্ট্রেসের বাড়িতে বুঝি থেকে গেছে বৃষ্টি-বাদলার জন্য। আমাদের হেড মিস্ট্রেসের সঙ্গে ওর দূর সম্পর্কের একটা আত্মীয়তা ছিল। সকালেও আসছে না দেখে খোঁজখবর নিতে গিয়ে শুনলাম নদীর ধারে ওকে পাওয়া গেছে। প্রাণ নেই। না, চিকিৎসা আর হলো কোথায়, পুলিশে ডেড বডি নিয়ে গেল!

—ঘুমের ওষুধ খেয়ে অত তাড়াতাড়ি...কতগুলো ওষুধ খেয়েছিল? পেল কোথায়?

—একটা কথা বলবো?

—বলো না, যা মনে আসে বলো—

—এটা খুব খারাপ কথা। তবু আমার মনে এসেছে। আমার জামাইবাবুর কিডনি অপারেশানের সময় অজ্ঞান করার জন্য ডাক্তার অ্যানেসথেসিয়া দিয়েছিল। ডোজ বেশি হয়ে গিয়েছিল, জামাইবাবুর আর জ্ঞানই ফিরলো না। আপনি কিন্তু এসব কথা কারুকে বলবেন না। বিকাশ ডাক্তারকে এখানে সবাই খুব পছন্দ করে। বিকাশ ডাক্তার চকবাজারে আসা বন্ধ করে দিলে অনেকেরই খুব অসুবিধে হবে।

আবেগের সঙ্গে সে পুলকেশের একটা হাত ধরে বললো, এই কথাটা আমি ঘুণাক্ষরেও কারুর কাছে উচ্চারণই করিনি। আপনি লেখক, আপনাকে সব কিছু বলা যায়।

পুলকেশ আর জয়ার কথা মন দিয়ে শুনছেন না। তিনি ভাবছেন তাঁর স্বপ্নের কথা।

একটু বাদে জয়া বললো, আমি রমেশ সিকদারের বাড়ি যাবো না। আমাকে এখানে

নামিয়ে দিন।

জয়া নেমে দাঁড়াবার পর পুলকেশ আলতোভাবে তার কাঁধ ছুঁয়ে বললেন, চিন্তার কিছু নেই, আমি কারুকে কিছু বলবো না। হয়তো ওরকম কিছু ঘটেনি।

গেটের কাছে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। সে পুলকেশকে নিয়ে চললো, বসবার ঘর ছাড়িয়ে বাড়ির অন্দরমহলে।

যেতে যেতে পুলকেশের মনে হলো, বিকাশ ডাক্তার যেন তাঁকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে। একটানা দশ মিনিট সে তাঁর সঙ্গে বসে কথা বলেনি। ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে সে বাড়িতেও থাকে না।

ভেতরের একটা ছোট ঘরে বসে আছেন রমেশ সিকদার। টেবিলের ওপর মদের বোতল ও গ্লাস সাজানো। ওঁর পাশে রয়েছেন উকিল গোলাম হোসেন।

রমেশ সিকদার বললেন, আসুন, আসুন, লেখকমশাই। গ্রামের উঠতি লেখকরা আপনাকে খুব বিরক্ত করছিল তো! তাই ডেকে পাঠালাম। আমরা এখানে কয়েকজন নিরিবিলিতে আড্ডায় বসি। আপনাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল, আপনার একটু পান-টানের অভ্যেস আছে। কাল সুবিধে হয়নি।

একটা চেয়ার টেনে বসে পুলকেশ হেসে বললেন, আমাকে দেখেই মনে হয়েছিল? সর্বনাশ!

রমেশ সিকদার বললেন, লেখক মানুষের একটু-আধটু এসব না হলে কি চলে? শুনেছি তো রবি ঠাকুর ছাড়া আর সব লেখকই খায়।

পুলকেশ প্রতিবাদ করলেন না। তাঁর জানা বেশ কয়েকজন লেখক ভয়ে কিংবা শুচিবাইতে মদ্য স্পর্শ করেন না।

পুলকেশ আগ্রহের সঙ্গেই গেলাশে চুমুক দিলেন। ঘুমের ওষুধ আনেননি, খানিকটা মদ্য পান করলে ঘুমের আর কোনো অসুবিধে হয় না।

রমেশ সিকদার জিজ্ঞেস করলেন, গোলাম সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তো?

গোলাম হোসেন বললেন, হ্যাঁ, নদীর ধারে অনেকক্ষণ গল্প করলাম। উনি আমার বাড়িতে চা খেতে গেলেন না।

রমেশ সিকদার বললেন, দূর, চা খেতে যাবে কেন মশাই! বিরিয়ানি-টিরিয়ানি খাওয়ার জন্য ডাকতেন, তবে তো!

গোলাম হোসেন বললেন, চলুন, কালই চলুন।

পুলকেশ বললেন, আমি কাল সকালেই ফিরে যাচ্ছি।

পুলকেশকে অবাক করে দিয়ে রমেশ সিকদার বললেন, চলে যাচ্ছেন? তা ভালোই করছেন। আপনাদের মতন ব্যস্ত লোক এই অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে থেকে কী হবে?

তারপর পুলকেশের চোখে চোখ রেখে খানিকটা তীব্রকণ্ঠে বললেন, এখানে কোনো

গল্পের প্লট খুঁজে পেলেন নাকি?

পুলকেশের মনে হলো, রমেশ সিকদার যেন কোনো ব্যাপারে তাঁকে সাবধান করতে চাইছেন। হুইল চেয়ারে বসে থাকেন, বাড়ি থেকে বেরোন না, তবু ইনি জানেন অনেক কিছু।

পুলকেশ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, নাঃ! আমি গল্পের প্লট খুঁজতে কোথাও যাই না।

গোলাম হোসেন বললেন, দেখবেন স্যার, আমাদের যেন কোনো গল্পে ভিলেইন বানিয়ে ফেলবেন না। এই বয়েসে তো নায়ক হতে পারবো না।

নিজের রসিকতায় তিনি নিজেই হেসে ফেললেন।

একটুক্ষণ গল্পগুজব করার পর সেখানে উপস্থিত হলো আর একজন। ডাক্তার বিকাশ নন্দী।

রমেশ সিকদার বললেন, কীগো ডাক্তার, তোমাকে যে খুব ক্লান্ত লাগছে?

বিকাশ বললো, এই শীতের শেষ দিকটায় কেন যে রুগীর সংখ্যা বেড়ে যায়, বিশেষত পুরোনো হার্টের রুগীরা...আজ অনেক পেশেন্ট দেখতে হয়েছে।

রমেশ সিকদার বললেন, আমি তো গেলাশ ধরে ফেলেছি, এখন আর আমার প্রেসার মেপে লাভ নেই। আর চিকিৎসা করতে হবে না, বসো, দু'পাত্তর মাল খাও।

বিকাশ পুলকেশের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনার মতন পেশেন্ট পেলে যে-কোনো ডাক্তার বর্তে যাবে। কাল রাত্রে খুব খারাপ অবস্থা, আজ একদম ফিট।

পুলকেশ বললেন, আপনার ওষুধে খুব ভালো কাজ হয়েছে।

গোলাম হোসেন বললেন, আমার নাতির হঠাৎ একবার কলেরা হলো। সিউড়িতে নিয়ে যেতে হলে ততক্ষণ বাঁচতো কিনা সন্দেহ। বিকাশ ডাক্তার তাকে বাঁচিয়ে দিল। প্রাণটা ফিরিয়ে দিল বলা যায়। আর কোনো ডাক্তারের ওপর এখানে ভরসা করা যায় না।

রমেশ সিকদার বললেন, যাক, এখন রোগ-ভোগের কথা বাদ দাও!

এর পর প্রায় এক ঘণ্টা অন্য গল্প হলো। মীনাক্ষীর নাম উচ্চারিত হলো না একবারও। রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা এখানেই।

তিন-চার পেগ হুইস্কি খেয়ে পুলকেশ কোনোদিন বেচাল হন না। আজ তিনি ইচ্ছে করে খানিকটা মাতাল হয়ে যাওয়ার ভান করলেন। তিনি রাত্তিরে আর বিকাশের বাড়ি ফিরতে চান না। ঐ হাসপাতাল-মার্কা লোহার খাটে সুস্থ অবস্থায় শুতে কারুর ভালো লাগে? রমেশ সিকদার বলেছিলেন, তাঁর এখানে অতিথির জন্য ঘর আছে, সব ব্যবস্থা আছে।

পুলকেশ চাইছিলেন, মীনাক্ষীর প্রসঙ্গ একবার উঠুক। কিন্তু তিনি নিজে থেকে কিছু বলবেন না। প্রসঙ্গটা এলো অন্যভাবে।

একসময় রমেশ সিকদার বললেন, স্কুলে একজন নতুন টিচার নেওয়া হবে। কাল ইন্টারভিউ। আমি তো যেতে পারবো না। আমার বাড়িতেই হবে। গোলাম সাহেব, আপনি কাল থাকছেন তো?

গোলাম হোসেন বললেন, কাল সকালেই আমায় সিউড়ি যেতে হবে। জরুরি কেস আছে।

রমেশ সিকদার বললেন, কাল তো আদালত বন্ধ। কী যেন একটা পরব আছে। আপনার এত ব্যস্ততা কিসের? থেকে যান কাল। যে সব ক্যান্ডিডেট আসছে, লিস্ট দেখলাম, কেউই তেমন সুবিধের নয়। এরকম ছোট জায়গায় ভালো টিচার আসতে চায় না। মীনাক্ষীর মতন আর পাওয়া যাবে না।

পুলকেশ ফস করে বললেন, মীনাক্ষীকে আমি চিনতাম। আমাকে সে এখানে আসবার জন্য অনুরোধ করেছিল। আমাকে সে চিঠি লিখতো। বাংলায় ভালো দখল ছিল।

রমেশ সিকদার আস্তে আস্তে বললেন, হুঁ, তা ছিল। এরকম ছোট জায়গায় সেরকম কোনো বড় ঘটনা তো ঘটে না। হঠাৎ একটি মেয়ে আত্মহত্যা করে বসলো। তাও স্কুলের শিক্ষিকা। বাড়ি-ঘর ছেড়ে এত দূরে থাকতো। লোকে তাই ভুলতে পারছে না। মেয়েটার অনেক গুণ ছিল, দু'একটা ভুলও সে করে ফেলেছিল।

পুলকেশ বললেন, কী ভুল করেছিল?

রমেশ সিকদার বললেন, সে সব কথা বলে আর কী হবে! রবি ঠাকুরের গান আছে না, যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে রইবো কত আর!

পুলকেশ বিকাশের দিকে ফিরে বললেন, ওর পোস্ট মর্টেম হয়েছিল?

বিকাশ একটু চমকে গিয়ে পুলকেশের দিকে তাকালো। তারপর ক্লান্তভাবে টেনে টেনে বললো, তা তো হবেই...আন-ন্যাচারাল ডেথ...পুলিশ কেস, আমিই তো ডেড বডি সঙ্গে নিয়ে সিউড়ি গেলাম, সরকারি ডাক্তার ছুটিতে ছিল, আমাকেই করতে হলো ঐ কাজ।

পুলকেশ দেখতে পেলেন, বিকাশের দু'চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু চিকচিক করছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর, পুলকেশ এখানেই থেকে যেতে চান শুনে বিকাশ একটু অবাক হলেও বিশেষ আপত্তি করলো না। ব্যাগ থেকে কিছু ওষুধ বার করে বললো, হয়তো আর হবে না। তবু দৈবাৎ যদি পেটব্যথাটা চাগিয়ে ওঠে, এই ওষুধ খাবেন।

অন্য দু'জন চলে যাবার পরেই শুয়ে পড়লেন পুলকেশ। এখানে চমৎকার ব্যবস্থা। মস্ত বড় ঘর, পুরনো আমলের খাট, পুরু তোশকের বিছানা। ভুবন সরকারের বাড়ির চেয়েও অনেক ভালো।

শোওয়া মাত্র ঘুম এলো না, পুলকেশ আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে লাগলেন। এখানে এসে তিনি যে-সব স্বপ্ন দেখেছেন, তার সঙ্গে বাস্তব ঘটনার মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। শুধু একটা ব্যাপার ছাড়া। ছোটুলাল কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে ঘুমন্ত মীনাক্ষীকে। সেটা

কী করে হয়? সবাই বলছে, মীনাক্ষীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে নদীর ধারে। ছোটুলালই শুধু জানিয়েছে যে মীনাক্ষী মারা গেছে বিকাশের নার্সিংহোমের খাটে। মাতালের কথা বিশ্বাস করা যায়? পুলকেশ ঐ স্বপ্নটা দেখলেন কেন? তবে কি মীনাক্ষী আগে চলে এসেছিল বিকাশের বাড়িতে। সেখানে বিকাশের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে, রাগের মাথায় বিষ কিংবা ঘুমের ওষুধ খেয়ে মারা যায়। ঐ বাড়িতে মীনাক্ষীর লাশ পাওয়া গেলে কেলেঙ্কারি হতো। তাই ডাক্তারের নির্দেশে ছোটুলাল মীনাক্ষীর মৃতদেহ কোলে করে নিয়ে গিয়ে নদীর ধারে রেখে দিয়ে আসে? ছোটুলালের প্রাণ বাঁচিয়েছেন বিকাশ। সে তার প্রায় ক্রীতদাস, সে বিকাশের কোনো আদেশ অমান্য করবে না। কিন্তু গোপনীয়তা একটা বিষম বোঝা। ছোটুলালের পক্ষে দিনের পর দিন এই গোপনীয়তার বোঝা টানা খুব কষ্টকর, তাই সে হঠাৎ কিছুটা বলে ফেলেছে পুলকেশের কাছে?

কিন্তু ছোটুলাল কিছু বলার আগেই পুলকেশ কী করে স্বপ্নে দেখলেন যে সে মীনাক্ষীকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে? স্বপ্নের এ কী রহস্য? কিংবা মীনাক্ষীই এই স্বপ্নটা তাঁকে দেখালো?

তা হলে তো মীনাক্ষীর আত্মহত্যার জন্য বিকাশকে অনেকটাই দায়ী হতে হয়। কোনো মানুষকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেওয়াটাও একটা গুরুতর অপরাধ। স্বপ্নে দেখা দিয়ে মীনাক্ষী বলছিল, আমি মরতে চাই না, আমি বাঁচতে চেয়েছি!

কিংবা, এমন কি হতে পারে, মীনাক্ষী ঘুমের ওষুধ খায়নি, রাগের মাথায় বিকাশ ওকে বেশি ডোজের অ্যানেসথেসিয়া ইঞ্জেকশান দিয়ে দিয়েছে? সে নিজেই পোস্ট মর্টেম করেছে ডেড বডি, কোনো প্রমাণ থাকলো না। তা হলে তো এটা খুনের ব্যাপার হয়। না, না। বিকাশকে ঠিক খুনী বলে মনে হয় না। তার চোখে জল ছিল।

কিছুদিন মীনাক্ষীর সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করেছে বিকাশ। তারপর তার প্রেম নিঃশেষ হয়ে গেছে। এজন্য বিকাশকে তো দোষ দেওয়া যায় না। চিরস্থায়ী প্রেমের কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে? এরকম প্রতিশ্রুতিরও কোনো মূল্য নেই। মীনাক্ষী তো জেনেশুনেই একজন বিবাহিত লোকের সঙ্গে প্রেম করেছিল। প্রেম ফুরিয়ে গেলে তার দুঃখ পাওয়া ছাড়া গতি ছিল না। এখান থেকে নিঃশব্দে সরে যাওয়াই তার উচিত ছিল। তার বদলে সে একেবারেই হারিয়ে গেল। কিংবা কেউ তাকে পৃথিবী ছেড়ে যেতে বাধ্য করলো?

ব্যর্থ প্রেমের তীব্রতায় মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে, খুন কিংবা আত্মহত্যা, কোনোটাই অসম্ভব নয়।

পুলকেশ নিজেকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি আজ বিকাশ ডাক্তারের বাড়ি ফিরে যেতে রাজী হলাম না কেন? ভয় পেয়েছি? স্বপ্ন দেখার ভয়? পাশের খাটে মীনাক্ষীর মৃতদেহ ছিল। কিংবা, আজ রাত্তিরে যদি আবার পেটব্যথা হয়, বিকাশ ডাক্তার যদি ঘুমের ওষুধ দিতে গিয়ে বেশি দিয়ে ফেলে, না, না, এর কোনোটাই নয়, একটু ভালো জায়গায় শুতে ইচ্ছে করেছে।

রমেশ সিকদার কিংবা গোলাম হোসেনের মতন হোমরাচোমরারা অনেকেই এখানে

বিকাশ ডাক্তারের কাছে উপকৃত। মীনাক্ষীর মৃত্যুর ব্যাপারে বিকাশের কিছুটা দায়িত্বের কথা ওঁরা জানলেও মুখ খুলবেন না। ওঁদের দু'জনেরই ব্যবহারে সেরকম মনে হলো। পুলকেশ এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে গেলে ওঁরা খুশি হন।

এইসব ভাবতে ভাবতে পুলকেশ ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু কোনো স্বপ্ন দেখলেন না। কয়েক ঘণ্টা বেশ গাঢ় ঘুম হলো তাঁর।

হঠাৎ একসময়ে একটা বিকট শব্দ হতে শুধু যে ঘুম ভাঙলো তাই-ই নয়, তিনি ভয়ে আঁতকে উঠলেন। তাঁর মনে হলো, দরজা ভেঙে কেউ তাঁকে খুন করতে আসছে।

ঘুমের মধ্যে যে-কোনো শব্দই অনেক গুণ বেশি মনে হয়। উঠে বসে চোখ কচলাবার পর তিনি বুঝতে পারলেন, দরজা বন্ধই আছে, বাইরের দিকের একটা জানলার পাল্লা দমাস দমাস করে পড়ছে, বেশ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।

পুলকেশ খাট থেকে নেমে এসে জানলাটা বন্ধ করতে গিয়ে একটুক্ষণ বাইরের বৃষ্টি দেখলেন। প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। বৃষ্টির চেয়ে ঝড়ের বেগই বেশি। এ বছর একটু আগে কালবৈশাখী শুরু হলো।

জানলাটা বন্ধ করে খাটে এসে বসতেই তিনি দেখতে পেলেন মীনাক্ষীকে। ঠিক দরজাটা আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে।

একবার বুকটা কেঁপে উঠলো ঠিকই। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে পুলকেশ বললেন, মীনাক্ষী, আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখছি না। আমি আত্মার অস্তিত্বে কিংবা ভূত-প্রেতেও বিশ্বাস করি না। আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি কল্পনায়। অথচ বাস্তবের মতন সত্য মনে হচ্ছে। যদি তুমি সত্যিই বাস্তব হও, তা হলে বলো, কী তোমার দুঃখ? কী তোমার মৃত্যুরহস্য?

সেই মূর্তি কোনো উত্তর দিল না।

পুলকেশ আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার মৃত্যুর জন্য কারুকে শাস্তি দিতে চাও? স্বপ্নে তুমি বারবার ফিরে আসছো, আমি অনেকটা বুঝে গেছি—

ঝড় থেমে গিয়ে শুধু বৃষ্টি পড়ছে, বাইরে ডেকে উঠলো কয়েকটা পাখি। ঘরের মধ্যে এসে পড়লো ভোরের আলো। সেই মূর্তি মিলিয়ে গেল।

পুলকেশ আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। জেগে উঠে দেখলেন, বৃষ্টিও নেই, বেশ রোদ উঠে গেছে।

আদিনাথ গাড়ি নিয়ে এলো সাড়ে সাতটার সময়। বিকাশ ডাক্তারের বাড়ি থেকে তাঁর জিনিসপত্র তুলে নেওয়া দরকার। ওদের কাছ থেকে বিদায়ও নিতে হবে।

রমেশ সিকদার সাড়ে নটার আগে ঘুম থেকে ওঠেন না। কাল রাতেই সে কথা বলে রেখেছিলেন, তখনই বিদায় নেওয়া হয়ে গেছে।

বিকাশ ডাক্তারের বাড়িতে এসে বাইরের দিকে বারান্দায় বসতে হলো কিছুক্ষণ।

সুপ্রিয়া জলখাবার না খাইয়ে ছাড়বে না কিছুতেই। লুচি, বেগুন ভাজা, মোহনভোগ। তারপর চা।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে সুপ্রিয়ার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন পুলকেশ। সিউড়ির বাড়িতে একদিন আসতে হবে, কলকাতায় গেলে দেখা হবে।

বাগানে বিল্টুর সঙ্গে বল খেলছে বিকাশ। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে এদিকে। বাবাকে দু'-একবার হারিয়ে দিয়ে খলখল করে হাসছে বিল্টু। কী সুন্দর বাচ্চাদের এই বয়সের হাসি!

এত বৃষ্টি হওয়ার পর গাছপালাগুলো যেন স্নান করে সেজেগুজে রয়েছে। রোদে আঁচ নেই, আজকের সকালটি ভারি মনোরম।

এখানে আজ সব কিছুই ঠিকঠাক চলছে। শুধু মীনাক্ষী নামে একটি মেয়ে চিরকালের মতন হারিয়ে গেল। রাগে, দুঃখে, অভিমানে কিংবা কারুর আক্রোশে। বিকাশের যতটুকুই ভূমিকা থাকুক, তা আর খুঁচিয়ে তোলার কোনো মানে হয় কী? সুপ্রিয়া মেয়েটি বেশ ভালো, এত চমৎকার ওদের ছেলেটি, এদের তো কোনো দোষ নেই। বিকাশের নামে পুলিশ কেস হলে তছনছ হয়ে যাবে এই সুখের সংসার। সুপ্রিয়া কিংবা বিল্টুর জীবনে একটা বিশ্রী আঘাত দেবার কোনো অধিকার আছে কি পুলকেশের?

মীনাক্ষীর বদলে আজ এখানে নতুন টিচার আসবে। মীনাক্ষী তার প্রেমের মূল্য দিয়ে গেল জীবন দিয়ে। আস্তে আস্তে সবাই তার কথা ভুলে যাবে। যারা হারিয়ে যায়, তারা একেবারেই হারিয়ে যায়। যারা বেঁচে থাকে, তাদের নিয়েই ঘুরতে থাকে এই পৃথিবী।

পুলকেশ নিঃশব্দে বলতে লাগলেন, আমি তোমায় মনে রাখবো মীনাক্ষী। তুমি আমাকে একটা নতুন অভিজ্ঞতা দিলে। এ রকম স্বপ্ন দেখার অভিজ্ঞতা আমার আগে কখনো হয়নি। আমি তোমাকে ভুলবো না।